সিংহলে শিল্প ও সভ্যতা

শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট
কলিকাতা

অধ্যায়সূচী

চিত্রসূচী

২১ ও ২২ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত চিত্র শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু কর্তৃক অঙ্কিত
অপর চিত্রগুলি গ্রন্থকার-কর্তৃক মূল চিত্র বা মূর্তি হইতে অনুকৃত

॥ মলাটের চিত্র ॥

উৎসর্গ

কলম্বো আনন্দ কলেজে
আমার সহকর্মী ও ছাত্রদের স্মরণে
১৯২৫-২৭

সিংহলে বৌদ্ধধর্মের প্রথম প্রচার

দেবনামপিয় তিস্‌স ৩০৭ খৃস্টপূর্বাব্দে সিংহলের সিংহাসনে আরোহণ করিলে তাঁহার বন্ধু ভারত-সম্রাট অশোককে বহুমূল্য উপঢৌকন প্রেরণ করেন। সম্রাট অশোকও বহুমূল্য উপহার পাঠাইয়া তিস্‌সকে নিজের সৌহার্দ্য জানান এবং সঙ্গে এই সংবাদও পাঠান—আমি বুদ্ধ ধর্ম ও সংঘের আশ্রয় লইয়াছি, শাক্যবংশীয়দের ধর্মে আমার আস্থা ও ভক্তি। হে নৃপতি, এই সত্য ধর্মে আপনার বিশ্বাস হউক এবং মুক্তির জন্য আপনি ইহাতে আশ্রয় লউন। এই বার্তা লইয়া অশোকের পুত্র মহেন্দ্র সিংহলে গমন করিয়াছিলেন।

প্রাচীন ইতিহাস মহাবংশে উল্লেখ আছে, বুদ্ধ অনেক বার সিংহলে পদার্পণ করিয়াছিলেন। এই ঘটনার যদিও ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই, তবুও সিংহলের বৌদ্ধগণ এই আখ্যায়িকা বিশ্বাস করিয়া থাকেন।

উল্লেখ আছে যে, বুদ্ধ মহেন্দ্রের জন্য পূর্ব হইতেই স্থান প্রস্তুত করিয়া রাখেন, কারণ তাঁহার বিশ্বাস ছিল লঙ্কাদ্বীপে তাঁহার ধর্ম গৌরবান্বিত হইবে। লঙ্কাদ্বীপে পূর্বে ছিল যক্‌খদের (যক্ষ) বাস। বুদ্ধ তাঁহাদিগকে দ্বীপ হইতে বাহির করিয়া দেন। যক্‌খরা যেখানে সমবেত হইত বুদ্ধ সেখানে আকাশপথে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং আকাশে ঝড়-বিদ্যুৎ-অন্ধকার আনিয়া যক্‌খদের মনে শঙ্কা জন্মাইলেন।

যক্‌খরা ভীত হইয়া কৃপা প্রার্থনা করিলে বুদ্ধ বলিলেন, 'তোমাদের মুক্তি দিব, যেখানে আমি তোমাদের সকলের অনুমতি অনুসারে অবতরণ করিতে পারি এমন স্থান দাও।' যক্‌খরা বলিল, সমগ্র দ্বীপই তাহারা বুদ্ধের জন্য ছাড়িয়া দিতে পারে। বুদ্ধ তখন মাটিতে অবতরণ করিয়া আসনে বসিলেন, অমনি আসনের চারিধারে আগুন জ্বলিয়া উঠিল এবং ক্রমশ দূরে দূরে ছড়াইতে লাগিল। তখন যক্‌খরা ভীত হইয়া সমুদ্রতীরে দৌড়াইয়া গেল। বুদ্ধ তখনি সমুদ্রের সুন্দর গিরি-দ্বীপকে তীরের নিকট লইয়া আসিলেন, যক্‌খরা সেই দ্বীপে গিয়া প্রাণরক্ষা করিল। গিরি-দ্বীপ তখন এই নূতন অধিবাসীদের লইয়া সমুদ্রের ভিতর পূর্বস্থানে সরিয়া গেল, যক্‌খরা তাড়িত হইলে বুদ্ধ নিজের আসন গুটাইয়া লইলেন। দেবতা-সকল তখন বুদ্ধের নিকটে সমবেত

হইলেন। বুদ্ধ তাঁহাদিগকে নিজের ধর্মে দীক্ষিত করিলেন। বর্তমানে যে শৈল অ্যাডাম্‌স্‌ পিক্‌ নামে অভিহিত, তার অধিপতি ছিল দেবতা সুমন, বুদ্ধ তাঁহাকে নিজের কেশের এক গুচ্ছ দান করিলেন। সুমন সোনার কৌটায় কেশের গুচ্ছ রাখিয়া তাহার উপর মরকত-মণির স্তূপ নির্মাণ করিয়া দিল।

আদিম অধিবাসীরা ছিল নাগপূজক। বুদ্ধ দ্বিতীয় বার যখন আসেন তখন নাগরাজকে দীক্ষা দিয়াছিলেন, বৎসর কয়েক পর বুদ্ধ লঙ্কাদ্বীপে আবার আসিলে নাগরাজ কেলানিতে১ একটি ভোজ দ্বারা তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন। এই আগমন চিরস্মরণীয় করিয়া রাখার জন্য বুদ্ধ আকাশে উঠিলেন এবং সুমন-পর্বতের (অ্যাডাম্‌স্‌ পিক্‌) শিখরে পায়ের ছাপ রাখিয়া গেলেন। আড়াই হাজার বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে, এখনও হাজার হাজার তীর্থযাত্রী এই পর্বতশিখরে আরোহণ করে এবং বুদ্ধের পদচিহ্নকে পূজা করিয়া থাকে।

অ্যাডাম্‌স্‌ পিক্‌ সিংহলের মধ্যভাগে অবস্থিত, ইহা সাড়ে সাত হাজার ফুট উচ্চ হইবে। উপরিভাগ সমতল, কোণাকৃতি—কতকটা জাপানের ফুজিয়ামার মত দেখিতে। নরম মাটির উপরে যে রকম পাঁচ আঙুলের ছাপ পড়ে, সে রকম পাথরের উপরে পায়ের ছাপ—গোড়ালি হইতে আঙুলের ডগা পর্যন্ত—চার-পাঁচ ফুট লম্বা হইবে। বৌদ্ধরা এই পায়ের ছাপকে বুদ্ধের বলিয়া উল্লেখ করে, হিন্দুরা বলে বিষ্ণুর, মুসলমান ও খৃস্টানেরা বলিয়া থাকে আদমের। মানবের আদি পিতা আদম জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাইয়া স্বর্গ হইতে দেবদূত কর্তৃক বিতাড়িত হইয়া এই শৈলশিখরে পতিত হন, তাই আদমের পায়ের ছাপ। বছরের বিশেষ সময়ে তীর্থযাত্রীরা বৌদ্ধ হিন্দু মুসলমান খৃস্টান সকলেই এখানে দর্শন করিতে আসে। অন্য সময়ে ঝড় বজ্রপাত ও হিংস্র পশুর আধিক্যের জন্য অ্যাডাম্‌স্‌ পিক্‌ দুরধিগম্য। অতি প্রত্যুষে শৈলশিখরে পৌঁছিতে হয়, সেজন্য রাত্রে মশালহস্তে পর্বতারোহণ করিতে হয়। সে এক মনোমুগ্ধকর দৃশ্য—অন্ধকারে পাহাড়ের গায়ে দীপের মালা মেঘে ঢাকিয়া অদৃশ্য হইতেছে, ক্ষণেক পরে প্রকাশিত হইতেছে; মুহূর্তে মুহূর্তে নূতন দৃশ্যের অবতারণা! মাঝে মাঝে যাত্রীদের বিশ্রামের জন্য পানশালা অর্থাৎ পান্থশালা আছে। এগুলি পুণ্যাভিলাষী সিংহলীরা নির্মাণ করিয়া রাখিয়াছে; এগুলি নারিকেল-পাতায় ছাওয়া, ভিতরে বসিবার জন্য বাঁশের বেঞ্চ আছে। পানশালাতে গরম কাফি বিতরিত হয়। পথশ্রমে ক্লান্তি এবং রাত্রে পাহাড়ের শৈত্যের ভিতর এই গরম কাফিটুকু যে কি আরামপ্রদ, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। অতি প্রত্যুষে শৈলশিখরে আরোহণ করিলে দেখা যায় আলোর মেলা—চতুর্দিকে দিকচক্রবাল ঘিরিয়া রহিয়াছে এই আলো। অ্যাডাম্‌স্‌ পিক্‌ হঠাৎ ঊর্ধ্বে উঠিয়া গিয়াছে, চতুর্দিকে অনেক নীচে সমুদ্রের মত নানা রঙের পাহাড়ের ঢেউ দিকচক্রবালে গিয়া মিশিয়াছে। কোথাও সব মেঘের যবনিকায় ঢাকা—কোথাও বা যবনিকা ছিঁড়িয়া ঘননীল শৈলশ্রেণীর প্রকাশ। এই প্রসঙ্গে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য বৌদ্ধ হিন্দু মুসলমান খৃস্টান প্রভৃতির সম্মিলিত যাত্রা এবং সকলের একই স্থানে পূজা। পৃথিবীতে এবং কোনো কালে বোধ হয় এরূপ ঘটনার সমাবেশ হয় নাই। সকলেই নিজের অভীষ্ট দেবতার উদ্দেশে চলিয়াছে, কারও সঙ্গে

---

১ কলম্বো হইতে ছয় মাইল দূরে। এখানে একটি পুরাতন বিহার আছে।

কারও বিবাদ-বিসম্বাদ নাই। যাত্রাকালে বৌদ্ধরা উচ্চারণ করিতেছে সাধু-সাধু, হিন্দুরা হর-হর, মুসলমানেরা আল্লা হো আকবর।

মিহিনতাল শৈল ভিক্ষুশ্রেষ্ঠ মহেন্দ্রের স্মৃতিপূত। এখানেই প্রথম বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হইয়াছিল। অনুরাধাপুর হইতে মিহিনতাল শৈল আট মাইল দূরে, অরণ্যের ভিতর দিয়া পথ। বৃহৎ সরোবর নুয়র বেওয়া (Nuwara Wewa) পথের ধারে। রাজধানী অনুরাধাপুর হইতে মিহিনতালের পথে এক সময় নৃপতি ভটিকাভয় (খৃস্টপূর্ব উনিশ শতক) চাদর বিছাইয়া দিয়াছিলেন—যাহাতে তীর্থযাত্রীরা ধূলা না মাড়াইয়া রুয়ানবেলি দাগোবা হইতে মিহিনতালে যাইতে পারে। মিহিনতাল শৈল এক হাজার ফুট উচ্চ। ১৮৪০ খানা পাথরের সিঁড়ি পার হইয়া উপরে পেঁছিতে হয়। রাবণের স্বর্গের সিঁড়ি কোথাও দেখা যায় না—এই সিঁড়িকে স্বর্গের সিঁড়ি আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। দুই পাশের বৃক্ষরাজি এবং মাঝে মাঝে বিহারের ধ্বংসাবশেষ এই সোপানাবলীকে একটা গাম্ভীর্য দান করিয়াছে। ইটালীর শিল্পী লরেঞ্জো ঘিবার্টি (Lorenzo Ghiberty) নির্মিত দুইটি ব্রোঞ্জের দ্বারকে মাইকেল এঞ্জেলো স্বর্গদ্বার বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন, এই সোপানাবলীকে ঠিক তেমনি স্বর্গের সিঁড়ি বলা যায়।

সমগ্র মিহিনতাল এক সময় বিহার ও স্তূপে ভরিয়া গিয়াছিল। তিস্স হইতে আরম্ভ করিয়া সকল বৌদ্ধ নৃপতিই মিহিনতালকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন। ভিক্ষু চিকিৎসক ভাস্কর স্থপতি চিত্রকর কারুশিল্পী ভৃত্য ও নানা শ্রেণীর কর্মচারী—সকলের ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ ছিল। রাজকোষ হইতে সকলের বেতন ও বিহার প্রভৃতির জন্য অর্থ নির্দিষ্ট ছিল। মিহিনতালে অনেক শিলালেখ পাওয়া যায়—তাহাতে প্রাচীনকালের বিধিব্যবস্থা অনেক জানা যায়। প্রাচীন চিকিৎসাশালা ও পাকশালার ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। মিহিনতালের অধিবাসীদের জন্য জলনিষ্কাশনের সুব্যবস্থা ছিল। পাহাড়ে মাঝে মাঝে ছোট স্বাভাবিক জলাশয় আছে—সিংহলী ভাষায় তাহাকে পোকুন (পুকুর) বলে। মিহিনতালের নাগ-পোকুন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পাহাড়ের গায়ে পাঁচ ফণাওয়ালা এক বিষধর সর্প খোদাই করা, সাপের লেজ জলের ভিতরে রহিয়াছে, সাপ যেন জলের উপরে মাথা তুলিয়া বিষ উদ্গিরণ করিতেছে। চারিদিকের শ্যামল বৃক্ষরাজি, ঝিঁঝিপোকার একটানা শব্দ এবং নির্জনতা এ স্থানকে রহস্যময় করিয়াছে। সাপ হইতেই নাগ-পোকুন নামের উৎপত্তি। এই পোকুন হইতে পাথরের পয়ঃপ্রণালী ও লোহার নলের সাহায্যে অন্যত্র জল লওয়ার ব্যবস্থা ছিল। এসব অবশ্য এখন নষ্ট হইয়া গিয়াছে। নাগ-পোকুনের জল অনেক দূরে একটা চৌবাচ্চায় লওয়া হইত। চৌবাচ্চার গায়ে একটা সিংহের মূর্তি খোদাই করা; সাত ফুট চার ইঞ্চি উচ্চ। সিংহ সামনের দুই পা তুলিয়া গর্জন করিতেছে, কারও উপর যেন ঝাঁপ দিয়া পড়িবে এই ভাব। এই চৌবাচ্চার নাম সিংহ-পোকুন। চৌবাচ্চা হইতে একটা লোহার নল সিংহের মাথার ভিতর প্রবেশ করিয়াছে, মুখের ভিতর দিয়া জল পড়ার ব্যবস্থা। ইহার শিল্পনৈপুণ্য ও কল্পনার মৌলিকতা নিশ্চয়ই খুব প্রশংসার বিষয়। পর্বতশিখরে দাগোবা এট বিহার (Et Vihara), বুদ্ধের কপালে বামচক্ষুর ভ্রূর উপরে যে একটি কেশ তার উপরে এই স্তূপ নির্মিত। আর-একটি প্রাচীন দাগোবা—মহাসেয়া দাগোবা। এই দুই দাগোবা খৃস্টপূর্ব প্রথম শতকে প্রস্তুত। মিহিনতালে মহেন্দ্র দেহরক্ষা করেন; তাঁহার দেহাবশেষের উপর আম্বাস্থল দাগোবা নির্মিত। আম্বাস্থল দাগোবার

চারিদিকে পঞ্চাশটি সরু পাথরের স্তম্ভ আছে। মিহিনতালের সর্বাপেক্ষা দ্রষ্টব্য মহিন্দ-গুহা—মহেন্দ্র যেখানে শয়ন করিতেন। গুহার দুই দিক খোলা, উপরে পাথর ছাদের মত রহিয়াছে, ভিতরে স্থান মোটেই প্রশস্ত নয়। একজন মানুষ কোনো রকমে শয়ন করিতে পারে। মহিন্দগুহা হইতে দূরের উপত্যকার দৃশ্য অতিশয় মনোরম। সমুদ্রের মত উপত্যকা দিগন্তবিস্তৃত, হরিৎ পীত ও নীল রঙের অপূর্ব সমাবেশ। অনেক দূরে সবুজ বনের মধ্যে সরোবর দেখা যায়; রুপালি জলরেখা—মখমলের মধ্যে যেন তরবারি। যোগী মহেন্দ্র প্রকৃতির এই অপূর্ব নয়নস্নিগ্ধকর শোভার মধ্যে ধ্যানমগ্ন থাকিতেন।

মহাবংশে উল্লেখ আছে মিহিনতাল পর্বতে অনেক সহস্র সঙ্গী লইয়া নৃপতি তিস্‌স মৃগয়ায় বাহির হইয়াছিলেন। বর্তমানে যেখানে আম্বাস্থল দাগোবা তাহার নিকটেই আমগাছের নীচে মহেন্দ্র বসিয়াছিলেন। নৃপতি মহেন্দ্রকে দেখিয়া দাঁড়াইলেন। মহেন্দ্র সম্রাটকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'হে রাজন, এই যে গাছ, এর নাম কি?'

'ইহাকে আম্বোগাছ (আম) বলে।'

'এই গাছ ছাড়া আরও আম্বোগাছ আছে কি?'

'আরও অনেক আম্বোগাছ আছে।'

'এই আম্বো এবং আর ঐসব আম্বোগাছ ব্যতীত পৃথিবীতে আরও আম্বোগাছ আছে কি?'

'প্রভু! আরও অনেক গাছ আছে, কিন্তু সেসব আম্বোগাছ নয়।'

'অন্যসব আম্বোগাছ এবং অন্যসব গাছ, যারা আম্বোগাছ নয়, সেসব ছাড়া আরও কিছু আছে কি?'

'কি আশ্চর্য! এই যে আম্বোগাছ।'

'হে নরপতি, আপনি জ্ঞানী।'

মহেন্দ্র তখন তিস্‌স-এর কাছে বুদ্ধের বাণী প্রচার করিলেন, তিস্‌স সদলবলে বৌদ্ধ-ধর্ম গ্রহণ করিলেন।

পুরবাসী সকলে যাহাতে থেরোর দর্শন পায়, সেজন্য মহেন্দ্রকে রাজধানীতে রাজপ্রাসাদে লইয়া গেলেন। রাজপ্রাসাদের প্রাঙ্গণে পুরবাসীদের ভিড়। রাজা জনতা দেখিয়া বলিলেন, 'এই প্রাসাদে যথেষ্ট স্থান নাই, রাজকীয় বিরাট হস্তীশালায় স্থান হউক।' লোকেরা বলিয়া উঠিল, হস্তীশালাও যথেষ্ট প্রশস্ত নয়, কাজেই সকলে নন্দন নামক প্রমোদ-উদ্যানে গমন করিল। নন্দনের দক্ষিণদ্বার খোলা ছিল, নন্দন সুরম্য অরণ্যে অবস্থিত, গভীর ছায়া এবং কোমল শ্যামল তৃণের জন্য শীতল। পুরবাসী-সকল নন্দন উদ্যানে থেরোর দর্শন পাইল। তাঁহার নিকট বুদ্ধের অমৃতবর্ষী বাণী শুনিয়া নিজেদের ধন্য মনে করিল।

মহেন্দ্র সমবেত জনমণ্ডলীকে উপদেশ দান করিয়া নন্দন উদ্যানের দক্ষিণ দ্বার দিয়া বাহির হইয়া মহামেঘ প্রমোদ-উদ্যানে উত্তর-পশ্চিম দ্বার দিয়া প্রবেশ করিলেন। সেখানে এক মনোরম রাজপ্রাসাদ, অনুপম শয্যা, আসন প্রভৃতি আরামোপযোগী উপকরণ দ্বারা সজ্জিত করিয়া রাজা মহেন্দ্রকে বলিলেন, 'এখানে আরামে বাস করুন।' রাজা তখন মহামেঘ প্রমোদ-উদ্যান ভিক্ষুদের জন্য উৎসর্গ করিলেন। রাজা নিজের হাতে সোনার

লাঙল দিয়া মাটিতে দাগ কাটিয়া চারিদিকের সীমা নির্দেশ করিয়া দিলেন। সীমারেখা সমাপ্ত হইবার সময় ভূমিকম্প হইয়াছিল।

নৃপতি তিস্‌স-এর প্রধান কীর্তি অনুরাধাপুরের বোধিবৃক্ষ। বুদ্ধগয়াতে যে-বৃক্ষের নীচে বুদ্ধ নির্বাণলাভ করিয়াছিলেন, তিস্‌স তাহার শাখা আনাইয়া রোপণ করিয়াছিলেন। দুই হাজার বৎসরেরও অধিক হইয়া গিয়াছে, আজও এই বৃক্ষ অতীতের সাক্ষ্য দিতেছে—এই বৃক্ষই এখন পৃথিবীর মধ্যে প্রাচীনতম।

রাজা এবং রাজ্যের অপরাপর সকলে বুদ্ধের ধর্মে দীক্ষিত হইলে স্ত্রীলোকেরাও দীক্ষালাভের ইচ্ছা জানায়। রাজকুমারী অনুলা ও তাঁহার সঙ্গীরা ভিক্ষুণীর ব্রত গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হন। মহেন্দ্র বলেন, ধর্মে দীক্ষাদানে তাঁহার অধিকার আছে, কিন্তু ভিক্ষুণীর ব্রতে দীক্ষা দেওয়া স্ত্রীজাতির এক জনের পক্ষেই সম্ভব। অশোকের কন্যা সংঘমিত্রা ছিলেন পাটলীপুত্রের ভিক্ষুণীদের মঠের অধিনেত্রী, তাঁহাকে আনয়ন করার প্রস্তাব হইল। তাঁহাকে লঙ্কাদ্বীপে আনিতে তিস্‌স মন্ত্রী অরিত্থকে পাঠান এবং অশোককে অনুরোধ করিয়া পাঠান যে, অশোক যেন এই সঙ্গে বোধিবৃক্ষের শাখা পাঠাইয়া দেন। ইহার পরে রাজকুমারী ভিক্ষুণী সংঘমিত্রা বোধিবৃক্ষের শাখা লইয়া লঙ্কাদ্বীপে আগমন করেন। সংঘমিত্রা ও তাঁহার সঙ্গিনীদের বাসের জন্য এক সুরম্য প্রাসাদ দেওয়া হইয়াছিল, তার নাম ছিল হত্থালোক।

বোধিবৃক্ষের শাখা আনয়নের অলৌকিক কাহিনীর বর্ণনা মহাবংশে আছে। শাখা স্থাপন করার জন্য চৌদ্দ ফুট পরিধি এবং আট ইঞ্চি পুরু এক সোনার পাত্র নির্মিত হইল।

মধ্যাহ্নসূর্যের ন্যায় এই পাত্র দীপ্তি পাইতেছিল। সৈন্য সামন্ত ও ভিক্ষুদের লইয়া বোধিবৃক্ষের নিকট অশোক গমন করিলেন। বিরাট উৎসবের অনুষ্ঠান—মণি মুক্তা নানা-প্রকার অলংকার এবং পতাকা দ্বারা বোধিবৃক্ষকে সাজানো হইয়াছিল। নানা বর্ণের পুষ্পসজ্জায় চতুর্দিক আমোদিত। হাত তুলিয়া সম্রাট অশোক আট দিকে প্রণাম করিলেন, পরে সোনার পাত্রটি একটি সোনার আসনে রাখিয়া নিজে বোধিবৃক্ষের উচ্চ শাখায় আরোহণ করিলেন এবং স্বর্ণলেখনী দ্বারা শাখায় লাল সিন্দুরের দাগ টানিয়া বলিলেন, 'বোধিবৃক্ষের সর্বোচ্চ শাখা যদি লঙ্কাদ্বীপে গমন করে এবং আমার যদি বুদ্ধের ধর্মে অবিচলিত বিশ্বাস থাকে তবে এই শাখা নিজে নিজেই বিচ্ছিন্ন হইয়া এই সোনার পাত্রে আসিয়া পড়ুক।' তৎক্ষণাৎ শাখা, যেখানে সিন্দুরের দাগ টানা ছিল, সেখানে বিচ্ছিন্ন হইয়া সুগন্ধ তৈলে পূর্ণ পাত্রে আসিয়া পড়িল। অশোক এই অলৌকিক কান্ড দেখিয়া আনন্দে চীৎকার করিয়া উঠিলেন; সমবেত জনমন্ডলীও আনন্দের প্রতিধ্বনি করিল। ভিক্ষুগণ সাধু-সাধু উচ্চারণ করিয়া হর্ষ প্রকাশ করিল। চারিদিকে নানা প্রকার গীতবাদ্য ধ্বনিত হইল।

স্বর্গে মর্তে পাতালে দেবতা যক্ষ রক্ষ দেবযোনি ভূত প্রেত পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ সকল প্রাণীর শব্দে সকল বিশ্ব নিনাদিত হইল। তার সঙ্গে প্রকৃতিও যোগ দিল, ভূমিকম্প হইল—সব মিলিয়া যেন তুমুল প্রলয়কান্ড।

রাজবংশের অনেকের উপর এই শাখার ভার দিয়া পোতের উপর তুলিয়া দেওয়া হইল। সম্রাট অশোক গঙ্গাপথে এইসঙ্গে সমুদ্রসংগম অবধি অনুগমন করিয়া পোত হইতে অবতরণ করিলেন। তারপর তিনি উপরের দিকে হাত তুলিয়া তীরে দাঁড়াইয়া রহিলেন, বোধিবৃক্ষের

শাখার বিদায়জনিত শোকে অধীর হইয়া গভীর আবেগে অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন, অবশেষে অশান্ত হৃদয়ে ক্রন্দন করিতে করিতে রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

বহুদিন সমুদ্রযাত্রার পর সিংহলের তীরে পোত উপস্থিত হইল। তিস্‌স এক প্রাসাদ নির্মাণ করিয়া বোধিবৃক্ষের শাখার অভ্যর্থনার জন্য সমুদ্রতীরে বাস করিতেছিলেন। সমুদ্র-পোত দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'বুদ্ধ যে বৃক্ষের নীচে নির্বাণলাভ করিয়াছিলেন, সেই বৃক্ষের শাখা আসিতেছে।' তিস্‌স অধীর হইয়া সমুদ্রজলে নামিলেন এবং গলাজলে দাঁড়াইলেন। যোলোজন বিভিন্ন জাতির লোকদের দ্বারা শাখাকে পোত হইতে নামাইয়া, এক সুরম্য রথে স্থাপন করিলেন। পথে পরিষ্কার সাদা বালি ছড়ানো ছিল। চৌদ্দ দিন চলার পর রথ অনুরাধাপুরে প্রবেশ করিল। পতাকা ও তোরণে পথ সাজানো ছিল। দিনের শেষে ছায়া যখন দীর্ঘ, তখন এই শোভাযাত্রা মহামেঘ উদ্যানে থামিল।

স্বর্ণপাত্র রথ হইতে নামানো হইলে শাখা মুহূর্তের মধ্যে আশি হাত ঊর্ধ্বে উঠিয়া গেল এবং স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, ছয় রঙের জ্যোতি প্রকাশ পাইল। পৃথিবী আলোকিত করিয়া সে দীপ্তি স্বর্গ পর্যন্ত পেঁাছিয়াছিল; সমুদ্রের ভিতরে সূর্য ডুবিয়া যাওয়া পর্যন্ত সে আলোক প্রকাশিত ছিল। রোহিণী নক্ষত্রে বৃক্ষশাখা পুনরায় স্বর্ণপাত্রে প্রবেশ করিল এবং বৃক্ষমূল পাত্রের উপরে উঠিয়া মাটির দিকে চলিল, স্বর্ণপাত্রসমেত মূল মাটির ভিতর প্রবেশ করিল। সকলে তখন ফুল ও নানাবিধ উপাদানে বৃক্ষকে পূজা করিল। গভীর ধারায় আকাশ হইতে বৃষ্টি নামিল এবং ঘনশীতল মেঘে বৃক্ষকে ঢাকিয়া রাখিল। সাত দিন পরে বৃষ্টি থামিলে বৃক্ষের জ্যোতি প্রকাশ পাইল।

সিংহলের বৌদ্ধদের মতে আটটি প্রধান তীর্থ আছে, তাহার মধ্যে এই বোধিবৃক্ষ অন্যতম। সিংহলী ভাষায় এই আট তীর্থকে বলে অটম স্থান।

নৃপতি তিস্‌স-এর অন্যান্য কীর্তি—মহাবিহার, থূপারাম, দাগোবা, মহিয়ঙ্গন দাগোবা, ইসুরু মুনিয়া বিহার, বেস্‌সা গিরি দাগোবা, তিস্‌স বেওয়া সরোবর ইত্যাদি।

তিস্‌স খৃস্টপূর্ব ৩০৭ হইতে খৃস্টপূর্ব ২৬৭ পর্যন্ত ৪০ বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁহার দীক্ষার উনিশ বছর পরে অর্থাৎ খৃস্টপূর্ব ২৮৮-তে সংঘমিত্রা বোধিবৃক্ষ লইয়া সিংহলে অবতরণ করেন। তিস্‌স-এর মৃত্যুর আট বৎসর পর পর্যন্ত মহেন্দ্র বাঁচিয়া ছিলেন অর্থাৎ খৃস্টপূর্ব ২৫৯-এ দেহত্যাগ করেন। সংঘমিত্রা আরও এক বৎসর বেশি বাঁচিয়া ছিলেন, অর্থাৎ খৃস্টপূর্ব ২৫৮-তে সংঘমিত্রা দেহত্যাগ করেন। অনুরাধাপুরে থূপারাম দাগোবার নিকটে একটি ছোট স্তূপ আছে তাহা সংঘমিত্রা-সোহন নামে খ্যাত। সকলের বিশ্বাস যে, সংঘমিত্রার দেহাবশেষ এই স্তূপের নীচে আছে।

বৌদ্ধধর্মকে অবলম্বন করিয়া সিংহলের সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছে। ভাস্কর্য স্থাপত্য চিত্র এবং সর্বপ্রকার কারুকর্ম ধর্মের প্রেরণায় প্রাণবন্ত হইয়াছে। স্তূপ মন্দিরাদি নির্মাণ করা এবং চিত্রিত করা রাজারা পুণ্যকর্ম মনে করিতেন। বৌদ্ধধর্মের আরম্ভ হইতে শেষ স্বাধীন নরপতি পর্যন্ত (খৃস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দী হইতে ১৮১৫ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত) সকলেই একাজে রাজকোষ মুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহারা যে শুধু নূতন মন্দিরাদি নির্মাণ করিয়াছেন তাহা নহে, প্রাচীন কীর্তিসমূহের মাঝে মাঝে সংস্কার সাধন করাইয়াছেন। কাজেই বলা যাইতে পারে, সিংহলের শিল্প ও কারুকলার ইতিহাস দুই হাজার বৎসর ব্যাপিয়া।

ভারতবর্ষে যে রকম অশোকের সময় হইতে ভারতীয় শিল্পের ইতিহাস আরম্ভ, তেমনি সিংহলে অশোকের সমসাময়িক নৃপতি দেবনাম পিয় তিস্‌স হইতে আরম্ভ। উত্তর মধ্যপ্রদেশে অবস্থিত প্রাচীন রাজধানী অনুরাধাপুরে ও পোলানারুয়াতে প্রাচীন স্থাপত্য-ভাস্কর্যাদির নিদর্শন দেখা যায়।

অনুরাধাপুর এক সময় সুন্দর অট্টালিকাশোভিত জনাকীর্ণ বিশাল নগরী ছিল। কাহারো মতে লণ্ডন এখন যত বড়, তত বড় ছিল অনুরাধাপুর। ২৫৬ বর্গ মাইল ক্ষেত্র। উত্তর দক্ষিণ গেটের দূরত্ব ১৬ মাইল। এক রাস্তায় ১১ হাজার বাড়ী, অনেক বাড়ী দোতলা, অসংখ্য ছোট রাস্তা। এক হাজার বৎসরের অধিক এখানে রাজধানী ছিল। অষ্টম শতাব্দীতে তামিল আক্রমণে ইহা পরিত্যক্ত হইলে, ইহা জঙ্গলে ঢাকিয়া যায় ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। অষ্টম শতাব্দী হইতে মাঝে মাঝে কিছু বাদে, চতুর্দশ শতাব্দীর গোড়ার দিক পর্যন্ত পোলানারুয়াতে রাজধানী ছিল। দ্বাদশ শতাব্দীতে সম্রাট পরাক্রমবাহু দি গ্রেট এবং কীর্তি নিস্‌সঙ্কমাল্ল পোলানারুয়াকে সমৃদ্ধিশালী করেন।

অনুরাধাপুরের ন্যায় তামিলদের আক্রমণে পোলানারুয়া বিধ্বস্ত হয়, এবং পরিত্যক্ত হইয়া জঙ্গলে আবৃত হইয়া পড়ে। পোলানারুয়া হইতে রাজধানী ক্রমান্বয়ে ডাম্বডেনিয়া, কুরুনেগালা, গাম্পোলা, কোটে, সীতাবাক ও কাণ্ডিতে স্থানান্তরিত হয়। চতুর্দশ শতক হইতে সংস্কৃতি ও শিল্প প্রাদেশিক লোকশিল্পে পরিণত হয়।

চতুর্দশ শতকে যদিও পোলানারুয়া বিধ্বস্ত হইয়াছিল, সিংহল শ্যামদেশে একজন

পণ্ডিত ও শিল্পী পাঠাইয়াছিলেন। শ্যামরাজ সূর্যবংশ মহাধর্ম রাজাধিরাজের রাজত্বকালে (১৩৫৭-১৩৮৮ খৃস্টাব্দ) সিংহলের একজন সংঘরাজ (শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ ভিক্ষু) আমন্ত্রিত হইয়া শ্যামদেশে গমন করেন ১৩৬১ খৃস্টাব্দে। তাঁর সম্মানার্থে একটি মন্দির নির্মাণ করা হয়। মন্দিরের পাথরের গাত্রে দ্বাদশ শতাব্দীর পোলানারুয়া রীতিতে খোদিত চিত্র দেখা যায়। সংঘরাজের সঙ্গে সম্ভবত কোনো সিংহলী শিল্পী শ্যামে গমণ করিয়াছিল।

প্রাচীন চীনা ঐতিহাসিকগণ সিংহলের মূর্তির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছেন। চতুর্থ এবং পঞ্চম শতাব্দী সিংহলের শিল্পের শ্রেষ্ঠ কাল। সিংহল এবং সুদূর প্রাচ্যে এ সময় যোগাযোগ ছিল। সময় সময় শিল্পদ্রব্য, বিশেষ করিয়া বুদ্ধমূর্তি চীনের সম্রাটকে উপঢৌকন দেওয়া হইত। আনামে (প্রাচীন চম্পা) একটি সুন্দর দাঁড়ানো ব্রোঞ্জ বুদ্ধমূর্তি (চতুর্থ শতাব্দী) পাওয়া গিয়াছে। অমরাবতীর এবং অনুরাধাপুরের বুদ্ধ-মূর্তির সঙ্গে ইহার সাদৃশ্য আছে। অনুমান করা হয় ইহা সিংহলে নির্মিত, চীনের সম্রাটের নিকট প্রেরিত মূর্তি কোনো প্রকারে চম্পাতে আসিয়া পোঁছিয়াছে।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর চীনা ইতিহাসে জানা যায়, চতুর্থ শতকে চীনের সম্রাট পায়ানটির রাজত্বের সময় সিংহল হইতে দূত আসিয়াছিল পাথরের মূর্তি লইয়া, মূর্তি চার ফুট দুই ইঞ্চি উচ্চ, পাঁচ প্রকার রংএ করা। মূর্তি এত সুন্দর যে, মানুষের তৈরি বলিয়া ভ্রম হইত। ইহার পরেও সিংহল হইতে দূত আসে।

বিখ্যাত চীনা পরিব্রাজক ফাহিয়ান ৪১৮ খৃস্টাব্দে সিংহলে অবতরণ করেন। অনুরাধাপুরের বিহারে দুই বৎসর থাকিয়া ধর্মপুস্তক নকল করেন। তিনি অনুরাধাপুরের ঐশ্বর্য ও উন্নতির সবিশেষ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি এক শোভাযাত্রার বর্ণনা করিয়াছেন, রাস্তার দুই দিক পাঁচ শত বুদ্ধমূর্তিতে সজ্জিত ছিল। মূর্তিগুলি বিভিন্ন বর্ণে চিত্রিত ছিল, এবং জীবিতবৎ ছিল। এগুলি নিশ্চয়ই কোনো অস্থায়ী পদার্থে নির্মিত ছিল, অধুনা যেমন 'বলি' অনুষ্ঠানে মূর্তি নির্মাণ করা হয়।

প্রাচীন সিংহলীদের ন্যায় ফাহিয়ান বিশ্বাস করিতেন বুদ্ধ নাগদের শাসন করিতে সিংহলে পদার্পণ করিয়াছিলেন। তিনি উল্লেখ করিয়াছেন, অলৌকিক শক্তি প্রভাবে বুদ্ধ এক পা রাখিয়াছেন অ্যাডাম্‌স্‌ পিকের উপরে, আর-এক পা অনুরাধাপুরে। অনুরাধাপুরে এক দাগোবা নির্মিত হইয়াছিল চার শত হাত উঁচু। সেখানে ভিক্ষুদের মঠ ছিল, পাঁচ হাজার ভিক্ষু বাস করিত। মন্দিরে সবুজ পাথরের বুদ্ধ ছিল বিশ হাত উঁচু। বুদ্ধ সাত রকম বহুমূল্য বস্তুতে অলংকৃত ছিলেন, ডান হাতে ছিল বহুমূল্য মুক্তা।

ফাহিয়ান ৪০০ খৃস্টাব্দে নানকিং-এর পশ্চিমে শানসি প্রদেশ হইতে যাত্রা করেন। মধ্যএশিয়ার ভিতর দিয়া পথ, সঙ্গী ছিল মাত্র দুইজন। একজনের মৃত্যু হয়, অপরজন তাঁহাকে ত্যাগ করে। ফাহিয়ান একাই হিমালয় অতিক্রম করিয়া ভারতে প্রবেশ করেন। সম্পূর্ণ বিনয়পিটক সংগ্রহ করিতে তিনি আসিয়াছিলেন।

অনুরাধাপুরে একজন বণিককে বুদ্ধমূর্তিকে সাদা সিল্কের পাখা দান করিতে দেখিয়া তাঁর দেশের কথা মনে পড়ে এবং চোখে জল আসে, পনেরো বৎসর ধরিয়া তিনি দেশছাড়া, কোনো সঙ্গী নাই।

ইহা বলাই বাহুল্য যে, সিংহলের শিল্পের সঙ্গে ভারতীয় শিল্পকলার নিকট-সম্বন্ধ। হয়তো অনেক মন্দির-মূর্তি ভারতীয় শিল্পীরাই নির্মাণ করিয়াছেন। বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে

ভারতের বৌদ্ধশিল্পও এখানে আসিয়াছে। বৌদ্ধ যুগে আসিয়াছে উত্তরভারতের কুশান ও গুপ্ত শিল্প। সিংহলের তামিল রাজাদের আমলে দক্ষিণ-ভারতের প্রভাব (চোল) সিংহলের উপর সুস্পষ্ট বর্তিয়াছে।

স্থাপত্য

ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রাচীন নগরীর কীর্তি-সকল দেখিতে গেলে প্রথমেই চোখে পড়ে সুউচ্চ দাগোবা। ভারতবর্ষে ইহা স্তূপ বলিয়া পরিচিত। ব্রহ্মদেশে বলে প্যাগোডা। দাগোবা সংস্কৃত ধাতুগর্ভ শব্দ হইতে উৎপত্তি হইয়াছে। স্তূপের ভিতর ধাতু-পেটিকায় বুদ্ধের কোনো চিহ্ন রাখা হয়, সেজন্য এ নাম।

দাগোবা হইল চতুষ্কোণ ভিত্তির উপর অর্ধগোলক। গম্বুজের উপর আছে একটি কুঠরী। ভারতীয় পরিভাষায় এই কুঠরীকে বলে হর্মিকা, সিংহলী ভাষায় দেবতা কোটুওয়া (দেবতা কুঠরী); ইহার উপর থাকে ছত্রাবলী। স্তূপের ভিতর থাকে স্মৃতি-চিহ্নের প্রকোষ্ঠ। ইহাতে রক্ষা করা হয় বুদ্ধের দেহাবশেষ; যেমন—নখ কেশ দন্ত অস্থি ইত্যাদি। সিংহলী শিল্প-শাস্ত্রের পরিভাষায় দাগোবার গম্বুজের আকার হইল 'জলের বুদ্বুদাকার'। দাগোবাগুলি সিংহলীদের শিল্প ও ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যার পরিচায়ক।

দাগোবাগুলি বৃহদাকার। সর্বাপেক্ষা বৃহৎ পিরামিড বাদ দিলে, অনেক দাগোবা মিশরের পিরামিডেব সমান। এগুলি ঠাসা ইঁটের তৈরি। অনেক পুরাতন দাগোবার উপর বড় বড় গাছ জন্মিয়া গিয়াছে; মনে হয় যেন ছোট-খাট পাহাড়। রাজায় রাজায় প্রতিযোগিতা হইত, কে কত উচ্চ দাগোবা করিতে পারে। একটি দাগোবার ভিতর এত ইঁট আছে যে, তদ্বারা একটি ছোট শহর নির্মিত হইতে পারিত। ভারতের কোনো স্তূপই সিংহলের ন্যায় বৃহদাকার নয়।

নৃপতি তিস্‌স অনেক দাগোবা নির্মাণ করিয়াছেন। তাহার ভিতর সুন্দর ও বিখ্যাত থুপারাম (স্তূপারাম) দাগোবা।

নৃপতি মহাসেন (২৭৭-৩০৪ খৃস্টাব্দ) নির্মাণ করেন জেতবনারাম নামে পরিচিত দাগোবা। ইহা ২৫১ ফুট উচ্চ; যে পাথরের মঞ্চের উপর ইহা নির্মিত তাহা ৮ একর জমির উপর। আর দাগোবার দেয়াল ঘেরা জমি ১৪ একর। ইহা হইতে দাগোবার বিরাটত্ব বুঝিতে পারা যায়। জেতবনারাম দাগোবার সঙ্গে জেতবনারাম বিহার ছিল। সিংহলে দাগোবা বিহার ও পানশালা একসঙ্গে থাকে; বিহার হইল বুদ্ধের মন্দির, আর পানশালা হইল ভিক্ষুদের বাসস্থান।

অভয়গিরি দাগোবা সর্বোচ্চ। নির্মাণ করিয়াছেন বট্‌ঠগামিনি অভয় (১০০-৭৬ খৃস্টপূর্ব)। স্তূপের ব্যাস ৩৬৭ ফুট, উচ্চ ৩১৫ ফুট।

সিংহলীদের কাছে সর্বাপেক্ষা প্রিয় এবং প্রাচীন স্মৃতিরঞ্জিত দাগোবা হইল রুবান বেলি দাগোবা। নির্মাণ করিয়াছেন দুট্‌ঠ গামিনি (১৬১-১৩৭ খৃস্টপূর্ব)। মহাবংশে ইহার নির্মাণের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা আছে। ভিত্তিভূমি শেষ হইলে দাগোবার বৃত্ত আঁকার জন্য রাজা একজন মন্ত্রীকে স্বর্ণকীলক দেওয়া রৌপ্যদণ্ড দিয়া ভূমির উপর বৃত্ত আঁকিতে বলিলেন। বিশাল বৃত্ত দেখিয়া মহাথেরা রাজাকে বলিলেন, এত বড় বিশাল চৈত্য

(চৈত্য) রাজার জীবিতকালে শেষ হইবে না এবং ইহার সংস্কার সাধন করাও কষ্টসাধ্য হইবে। তখন আরো ছোট করিয়া বৃত্ত আঁকা হইল। এই চৈতিয়র জন্য রাজা একটি রৌপ্যনির্মিত বোধিবৃক্ষ নির্মাণ করাইয়াছিলেন। তার পাতা ছিল সোনার। একটি সোনার বুদ্ধমূর্তিও নির্মাণ করাইয়াছিলেন।

চৈতিয়ের চূড়া এবং উপরের আস্তর শেষ হইবার পূর্বেই রাজা পীড়িত হইয়া পড়িলেন। রাজাদেশে তাঁহাকে পাল্কী করিয়া স্তূপের চারিদিকে প্রদক্ষিণ করানো হইল। প্রাঙ্গণে বিছানো শয্যায় তিনি শয়ন করিলেন। সমগ্র স্তূপটি সাদা কাপড়ে ঢাকা হইয়াছিল। রাজা লোহ পাসাদের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, চতুর্দিকে ভিক্ষুদের দেখিয়া আনন্দে পূর্ণ হইলেন এবং তাহাদের আশীর্বাদ গ্রহণ করিলেন। মহাথূপের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

লোহ পাসাদ অনুরাধাপুরে একটি জমকালো অট্টালিকা ছিল। ইংরেজিতে ইহাকে বলা হয় Brazen Palace। এই বাড়ির গম্বুজ ছিল পিতলের টালীর নির্মিত, সেজন্য এ নাম। নির্মাতা দুট্ঠগামিনি। ইহা ছিল নয়তলা কাঠের বাড়ি এবং প্রতি তলায় এক শতটি করিয়া কুঠরী। চতুর্থ শতাব্দীতে ইহা আগুনে পুড়িয়া যায়। ভিক্ষুদের জন্য এই বিরাট ভবন নির্মিত হইয়াছিল। বর্তমানে ইহার ভিত্তির ১৬০০টি পাথরের স্তম্ভ অবশিষ্ট আছে। স্তম্ভগুলি ১২ ফুট করিয়া উঁচু, ২৫০ ফুট পাশে, চতুষ্কোণ জমির উপর দাঁড়াইয়া আছে। মাদ্রাজের মহাবলীপুরমের রথের স্থাপত্য অনুযায়ী ইহার আকার ছিল। মহাবংশে লোহ পাসাদের মনোমুগ্ধকর বর্ণনা আছে। ইহা স্বর্ণ রৌপ্য রত্নাদি খচিত ছিল; বহুমূল্য আসবাবপত্র এবং পাত্র এখানে রাজা দান করিয়াছিলেন। প্রাসাদের মধ্যে একটি সভাগৃহ ছিল, ভিতরের স্তম্ভ ছিল সোনার। হাতীর দাঁতের একটি সিংহাসন ছিল, সিংহাসন সূর্য চন্দ্র তারা সোনা রূপা মুক্তা দ্বারা খচিত ছিল। মেঝেতে পশমের কার্পেট পাতা ছিল। ভাত রান্নার যে হাতা ছিল, তাহা পর্যন্ত সোনার ছিল। ব্রহ্মদেশে বর্তমানে যে ভিক্ষুদের কাঠের মঠ দেখা যায়, লোহ পাসাদ সম্ভবত সে রকম কিছু ছিল।

অষ্টম শতাব্দীতে বিজয়রাম সংঘারাম অনুরাধাপুরে নির্মিত হয়, তান্ত্রিক মহাযানদের জন্য। উল্লেখ করা দরকার, সিংহলীরা হীনযান বৌদ্ধ। দাগোবা, পানশালা, বিহার, সভাগৃহ, ভাণ্ডারগৃহ, গোসলখানা ইত্যাদি লইয়া অনেক অট্টালিকা এখানে ছিল। ১২ই একর জমি লইয়া এই বাড়িগুলি ছিল। ২০০।৩০০ গজ পাথরের দেওয়াল চারদিকে ছিল। দেওয়ালের কিছু কিছু চিহ্ন ছাড়া অট্টালিকার কোনো ভগ্নাবশেষ নাই। এত বড় জায়গা জুড়িয়া সংঘারাম বা ভিক্ষুদের মঠ ভারতবর্ষে পাওয়া দুষ্কর। এখানে নিশ্চয়ই স্থাপত্য ভাস্কর্য এবং চিত্রের উৎকৃষ্ট উদাহরণ ছিল।

পোলানারুয়ায় তামিলদের রাজত্বকালে একাদশ বা দ্বাদশ শতাব্দীতে হিন্দু মন্দির দেবল (দেবালয়) নির্মিত হইয়াছে। এইগুলি চোল স্থাপত্য অনুযায়ী। শিবদেবল একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। পাথরের মন্দির-ছাদ সমতল।

সিংহলের পাথরের মন্দিরগুলি আয়ত (rectangle) পাথর বা ইঁটের তৈরি, ভারতের মন্দিরের মত চতুষ্কোণ নহে। পোলানারুয়ায় দ্বাদশ শতাব্দীর থুপারাম দ্রাবিড় রীতি অনুযায়ী বৌদ্ধ মন্দির। সম্রাট পরাক্রমবাহু দক্ষিণভারত হইতে অনেক 'দামিলো' (তামিল)

শিল্পী আনাইয়াছিলেন। সিংহলের বর্তমানের অনেক রাজমিস্ত্রী (গালবাড়ুয়া) তামিল বংশোদ্ভূত। থূপারাম ইঁটের তৈরি খিলান করা ছাদ। ভিতরে চূণের আস্তর ও চিত্র ছিল। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে, কলম্বোর নিকটবর্তী আধুনিক হিন্দু মন্দির পোনাম্বল বাণেশ্বর কোবিল। ইহা স্বর্গীয় হিন্দু নেতা স্যার পোনাম্বল রামনাথনের প্রচেষ্টায় বহু লক্ষ অর্থ ব্যয়ে নির্মিত হইয়াছে। দক্ষিণভারত হইতে এজন্য এক শত কারিগর ও স্থপতি আনানো হইয়াছে। এইসকল কারিগরেরা প্রাচীন শিল্পীদের বংশধর। বংশপরম্পরা হিন্দু শিল্পশাস্ত্র ইহারা রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। প্রাচীন শিল্প শাস্ত্রানুযায়ী দক্ষিণভারতের মন্দিরের (মাদুরা) আদর্শে পাথরের এ বিশাল মন্দির নির্মিত হইয়াছে। ১৯২৫ সনে যখন আমি দেখিয়াছিলাম, তখন এখানে বহু বৎসর ধরিয়া কাজ চলিতেছিল। সিংহল দক্ষিণ-ভারতীয় রীতি গ্রহণ করিয়াছে, গোপুরমবাদে সিংহলের প্রাচীন বা আধুনিক মন্দিরে কোথাও গোপুরম নাই।

পোলানারুয়ার একটি উল্লেখযোগ্য বৌদ্ধ মন্দির দেমলমহাসেয়া বিহার। ইঁটের তৈরি আয়ত। ইহা দ্বাদশ শতাব্দীর ফ্রেস্কো চিত্রের জন্য বিখ্যাত।

গোলাকৃতি বিহার (ওয়ট-ডা-গে) সিংহলী স্থাপত্যের একটা বৈশিষ্ট্য। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষে, নৃপতি নিসসংকমাল্লের নির্মিত পোলানরুয়ার ওয়ট-ডা-গে শ্রেষ্ঠ।

পোলানারুয়াতে নির্মিত নৃপতি নিসসংকমাল্লের সাতমহল প্রাসাদ বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। এ রকম প্রাসাদ সিংহল অথবা ভারতবর্ষে কোথাও নাই। ইহা সপ্ততল বিশিষ্ট ইঁটের নিরেট অট্টালিকা। চতুষ্কোণ জমির উপর স্থাপিত আমাদের দোলমঞ্চের ন্যায় ক্রমশ সূক্ষ্ম হইয়া গিয়াছে। কাম্বোডিয়ান স্থাপত্য-রীতির প্রভাব ইহার মধ্যে আছে। সিংহলে এক সময় রাজার অধীনে কাম্বোডিয়ান ভারাটিয়া সৈন্য ছিল, সম্ভবত তাহাদের জন্য ইহা নির্মিত হইয়াছিল।

স্তম্ভ : দাগোবার চারদিকে বৃত্তাকারে ঘেরিয়া সুদৃশ্য সরু স্তম্ভ দেখা যায়। অনুরাধা-পুরের থূপারাম দাগোবা, লংকারাম দাগোবা, মিহিনতালের আম্বাস্থল দাগোবার চারদিকে স্তম্ভ আছে। এগুলিতে উৎসবের সময় প্রদীপ ঝুলাইয়া দেওয়া হইত। ওয়ট-ডা-গের ভিতর স্তম্ভ আছে, এর উপর এক সময় ছাদ ছিল। স্তম্ভের মাথায় কারুকার্য আছে। ভারতীয় স্তম্ভ হইতে সিংহলের স্তম্ভ সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের।

মকর-তোরণ : সিংহলের স্থাপত্যে মকর-তোরণের ব্যবহার দেখা যায়। সিংহলীরাও ইহাকে 'মকর-তোরণ' বলিয়া থাকে। ভারতীয় মকর-তোরণের ন্যায় ইহাতে সূক্ষ্ম কারুকার্য আছে। ভারতীয় মকর-তোরণ ভারতের বাহিরে গিয়াছে। যবদ্বীপের বরভূধর স্তূপে মকর-তোরণ দেখা যায়।

ভাস্কর্য

সিংহলের মূর্তির তারিখ একেবারে স্থির করিয়া বলা যায় না, ভারতীয় মূর্তিতে অনেক সময় দাতার নাম শিলালিপি হইতে জানা যায়, তাহা হইতে ভারতীয় মূর্তির তারিখ ঠিক হয়।

প্রস্তরফলক (স্টেলে) : দাগোবার প্রবেশপথে প্রচুর কারুকার্যখচিত প্রস্তরফলক দেখা

যায়। জন্তু, ফুল, লতা, পাতা শোভিত (floriated design) অলংকরণ আছে। একটি ঘট হইতে লতা-পাতা উঠিয়াছে; ইহাকে বলে পুন্নঘট (পূর্ণ ঘট)। সিংহলে উৎসবাদিতে পূর্ণঘট দেওয়ার রীতি আছে।

দোরুটুপাল : আর-এক রকম ফলক আছে, তাহাতে নরনারীর মূর্তি যক্ষ যক্ষিনী নাগ নাগিনী ও কুৎসিত বামনমূর্তি খোদিত। সিঁড়ির মুখে দুই দিকে দুটি মূর্তি থাকে, সিংহলী ভাষায় এই মূর্তিকে বলা হয় দোরুটুপাল (দ্বারপাল)। বিহারের চিত্রেও দরজার দুই দিকে দোরুটুপালের চিত্র থাকে। দোরুটুপালের ভাস্কর্যে অনেক সময় শিল্পনৈপুণ্য দেখা যায়।

অভয়গিরি প্রস্তর ফলকের মূর্তি সাঞ্চির ভাস্কর্যকে স্মরণ করাইবে, কিন্তু তাহা হইতেও উন্নততর। ইহা কুশান শিল্পের পরিচায়ক।

চন্দ্রশিলা : ইংরেজিতে ইহাকে moon-stone বলে। সিংহলী শিল্পের ইহা একটি বৈশিষ্ট্য। মন্দিরের সিঁড়ির নীচে, অর্ধচন্দ্রাকারের একটি পাথর থাকে, তাহাকে চন্দ্রশিলা বলে। নীচু রিলিফে ইহাতে ফুল লতা পাতা ঘোড়া সিংহ ষাঁড় হাতী ও হংসের অলংকরণ খোদিত আছে। ইহাতে সূক্ষ্ম কারুকার্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রতিকৃতি : সিংহলে রাজাদের প্রতিকৃতি দেখা যায়। মিহিনতাল আম্বাস্থল দাগোবার নিকট দেবনাম পিয় তিস্স-এর প্রতিকৃতি পাওয়া গিয়াছে। ইহাই প্রাচীনতম। রুয়ানবেলি দাগোবার নিকট রাজা ভট্টিকা অভয় (খৃস্টাব্দ ৪২-৭০) এবং দুট্ঠগামিনির (খৃস্টপূর্ব ১৬১—১৩৭) মূর্তি আছে। দাঁড়ানো মূর্তি প্রমাণ আকার হইতে একটু বড়। দ্বাদশ শতাব্দীর বিখ্যাত প্রতিকৃতি পরাক্রমবাহু দি গ্রেটের মূর্তি। পোলানারুয়াতে পাহাড়ের গা কাটিয়া তৈরি ১১½ ফুট উচ্চ। দুই হাতে তালপাতার পুঁথি (ওলা) ধরিয়া আছে। পরনে ধুতি। মুখে দাঁড়ি গোঁফ আছে। খুব গাম্ভীর্যব্যঞ্জক জ্ঞানী চেহারা। সাধারণ লোকদের বিশ্বাস ইহা পরাক্রমবাহু দি গ্রেটের মূর্তি। কিন্তু পোশাক দৃষ্টে কেহ কেহ মনে করেন, ইহা কোনো তামিল সাধুর মূর্তি।

বুদ্ধমূর্তি : তিন রকমের বুদ্ধমূর্তি দেখা যায়, বসা, দাঁড়ানো এবং শোওয়া। শ্রেষ্ঠ মূর্তি হইল অনুরাধাপুরের উপবিষ্ট ধ্যানী বুদ্ধমূর্তি। অবনীন্দ্রনাথ মনে করেন, ইহা সিংহল এবং ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ বুদ্ধমূর্তি। নির্বাত নিষ্কম্প দীপশিখার ন্যায় দীর্ঘ ঋজুদেহ। চতুর্থ শতাব্দীতে নির্মিত। বসা অবস্থায় উচ্চতা ৫ ফুট ৯ ইঞ্চি।

অওকন বিহারের দাঁড়ানো বুদ্ধ সিংহলে সর্বাপেক্ষা উচ্চ মূর্তি, পাদপীঠ সমেত ৪৬ ফুট উচ্চ। পৃষ্ঠদেশ পাহাড়ের সঙ্গে যুক্ত। মূর্তির বিরাটত্ব দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

পোলানারুয়াতে পাহাড়ের গায়ে কাটা কয়েকটি মূর্তির বিরাটত্ব এবং ভাবের গভীরতা মনকে অভিভূত করে। এগুলি গাল বিহারের মূর্তি বলিয়া পরিচিত। নির্মাতা পরাক্রমবাহু। তিনটি মূর্তি আছে। বুদ্ধের বসা মূর্তি, ১৫ ফুট উচ্চ; বুদ্ধের শায়িত মূর্তি ৪৬ ফুট লম্বা, পাশে দাঁড়াইয়া প্রিয় শিষ্য আনন্দ, প্রভুর তিরোধানে বিষাদ বিনম্র ভাব, আনন্দ ২৩ ফুট উচ্চ। বুদ্ধের মহানির্বাণের চিত্র মনকে স্তম্ভিত করে।

ইঁটের বুদ্ধমূর্তি : পোলানারুয়ার অনেক বিহারে এবং অন্যত্র ইঁটের তৈরী বিরাটাকার বুদ্ধমূর্তি দেখা যায়। সিমেন্ট দিয়া ইঁট জোড়া, উপরে চুণের আস্তর ও রং করা। আধুনিক কালেও বিহারে এই রীতিতে মূর্তি নির্মাণ করিতে দেখা যায়। পাথরের

মূর্তিতেও চুণের আস্তর দিয়া রং করার প্রথা ছিল। পোলানারুয়ার জেতবনারাম মঠের লঙ্কাতিলক মন্দিরে বিশালাকার দাঁড়ানো ইঁটের বুদ্ধমূর্তি আছে। লঙ্কাতিলক মন্দির সিংহলে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ মন্দির। থূপারাম মন্দির ও মহাসেয়া মন্দিরেও বিরাটাকার দাঁড়ানো বুদ্ধমূর্তি আছে।

কপিলমুনি (দ্বাদশ শতাব্দী) : ইসুরুমুনিয়া বিহারে, পাহাড়ের গায়ে উচ্চ রিলিফে খোদিত কপিলমুনির মূর্তি শিল্প-সমালোচকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। তাঁহারা ইহাকে ভাস্কর্যের একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন মনে করেন। রাজজনোচিত আরামের ভঙ্গিতে (মহারাজলীলা) বসিয়া আছে; পশ্চাতে একটি ঘোড়ার মুখ দেখা যাইতেছে। কপিলের মুখে বিরাট গাম্ভীর্য ও শক্তিমত্তার চিহ্ন। ইহা আকারে ছোট, কিন্তু পরিমাপ এমন মনে হয় যেন বিরাট মূর্তি (মনুমেণ্টাল)। মিশরের ভাস্কর্যের সঙ্গে ইহার তুলনা চলে। শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু মহাশয় এই মূর্তিকে খুব উচ্চে স্থান দেন।

ইসুরুমুনিয়া বিহারের প্রস্তরফলকে খোদিত রিলিফ মূর্তি, দম্পতির চিত্র উল্লেখযোগ্য।

জন্তুর চিত্র : সিংহলী শিল্পী হাতীর মূর্তিতে অপূর্ব দক্ষতা দেখাইয়াছে। ইসুরু-মুনিয়া বিহারে পাহাড়ের গায়ে নীচু রিলিফে খোদিত হাতীর মূর্তি আশ্চর্যজনক। পাহাড়ের নীচে একটি ছোট পোকুন (জলাশয়) আছে। হাতীর নিম্ন অংশ জলে ডোবা, হাতীর কাছে কতগুলি পদ্মফুল খোদা আছে। অত্যন্ত স্বাভাবিক হইয়াছে। হাতী শুঁড় দিয়া জল ছুঁড়িতেছে, জলে নামিয়া পদ্মবনে যেন জলকেলি করিতেছে। মাদ্রাজের মহাবলিপুরমের পাহাড়ের গায়ে খোদিত হাতীর চিত্র স্মরণ করাইয়া দিবে।

সিংহ : মিহিনতালের সিংহ উল্লেখযোগ্য। একটি চৌবাচ্চার গায়ে খোদিত উচ্চ রিলিফ ৭ ফুট ৪ ইঞ্চি উচ্চ। সিংহ সামনের দুই পা তুলিয়া গর্জন করিতেছে, যেন কারো গায়ে লাফাইয়া পড়িবে। এই সিংহের জন্য চৌবাচ্চার নাম 'সিংহ পোকুন'। চৌবাচ্চা হইতে একটা লোহার নল সিংহের মুখের ভিতর প্রবেশ করিয়াছে, অনবরত তীর্থযাত্রীদের জন্য সিংহের মুখ হইতে জল পড়িত। শিল্পী এবং ইঞ্জিনিয়ারের মৌলিকতা নিশ্চয়ই প্রশংসাযোগ্য। সিংহ হাতীর ন্যায় জীবিতবৎ নহে, কনভেনশনাল।

নাগ : সিংহলী শিল্পী নাগের মূর্তিতে খুব যত্ন নিয়াছে। মানুষের মাথার পিছনে, সাপের ফণাওয়ালা নাগদেবতার মূর্তি আছে। স্থাপত্যের অলংকরণে শুধু সাপের মূর্তিও আছে। মিহিনতালের নাগ-পোকুনের নাগ সর্বাপেক্ষা দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পাহাড়ের গহ্বরে ক্ষুদ্র জলাশয়, পিছনে পাহাড়ের গায়ে পাঁচ ফণাওয়ালা নাগ খোদিত, লেজ জলের ভিতর ডুবিয়া আছে; সাপ যেন জলের উপরে মাথা তুলিয়া বিষ উদ্‌গিরণ করিতেছে।

বুদ্ধ এক সময় সাত রাত্রি তপস্যা করিয়াছিলেন। তাঁহাকে রৌদ্র বৃষ্টি হইতে রক্ষা করিবার জন্য নাগরাজ তাঁহার মাথার উপর ফণা বিস্তার করিয়াছিলেন। এজন্যে সিংহলী ভাস্কর্যে নাগের স্থান।

ব্রোঞ্জ মূর্তি : সিংহলে ব্রোঞ্জের উচ্চশ্রেণীর বৌদ্ধ ও হিন্দু মূর্তি পাওয়া যায়। ইহার অধিকাংশই তামার। পঞ্চম শতাব্দী হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ধাতুমূর্তির কাল। পোলানারুয়াতেই অধিকাংশ মূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। কেহ কেহ মত পোষণ করেন,

এসব পোলানারুয়াতে তৈরি নহে, দক্ষিণভারত হইতে আনানো হইয়াছে। অন্য মতে, দ্রাবিড় স্থপতি পোলানারুয়াতে ঢালাই করিয়াছে।

সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত নটরাজের মূর্তি (৩ ফুট)। ভারতীয় শিল্প পূর্বে আলোচনা করিয়াছেন শুষ্ক প্রত্নতাত্ত্বিকেরা, তাঁহারা ভারতীয় শিল্পে সৌন্দর্য খুঁজিয়া পান নাই। তাঁহাদের কাছে একমাত্র গ্রীকশিল্পই আদর্শ ছিল। কিন্তু বর্তমানে ইউরোপের ভাস্কর ও চিত্রকরেরা প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন, গ্রীক আদর্শ পৃথিবীর চরম নহে। ফরাসীর বিখ্যাত ভাস্কর রোঁদা নটরাজের মূর্তির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছেন। নটরাজের মূর্তি আমাদের কাছে খুবই পরিচিত, ইহার পরিচয় অনাবশ্যক।

শিব দেবলে প্রাপ্ত অন্যান্য তামার হিন্দু মূর্তি—পার্বতী কার্তিকেয় গণেশ বিষ্ণু লক্ষ্মী বালকৃষ্ণ হনুমান সূর্য। শৈব সাধুদের মূর্তি পোলানারুয়ার একটা বৈশিষ্ট্য। শ্রেষ্ঠ হইল সুন্দরমূর্তিস্বামী (১ ফুট ৮ ইঞ্চি)। ৭০০ খৃস্টাব্দের কাছাকাছি তিনি ছিলেন মাদ্রাজের তিরুভরুর অধিবাসী। বিবাহের দিনেই তাঁর ডাক আসিল, বিবাহ-সজ্জাতেই তিনি সন্ন্যাসী হইয়া বাহির হইয়া গেলেন। সেই অবস্থার মূর্তি। চোখে-মুখে ভগবৎ-প্রেরণার ভাব। অবনীন্দ্রনাথ এই মূর্তির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছেন, রোঁদার লৌহযুগের (আয়রন এজ) ছবি দেখাইয়া তুলনা করিয়াছেন। মানুষ প্রথম লোহার সন্ধান পাইয়া আত্মহারা হইয়াছে। সেই আত্মহারার ভাবই রহিয়াছে সুন্দরমূর্তিস্বামীর মুখে, কোন্ অজানার সন্ধান যেন পাইয়াছেন। পোলানারুয়ায় এসকল মূর্তি নির্মিত হইয়াছে ১৩০০ খৃস্টাব্দের কাছাকাছি।

ব্রিটিশ মিউজিয়মে রক্ষিত প্রমাণ আকারের মূর্তি পাট্টিনি দেবী বিশেষ বিখ্যাত। ভারতবর্ষ হইতে আসিয়া পাট্টিনি সমগ্র সিংহলে পূজা পাইতেছেন।

সম্রাট গজবাহু (দ্বিতীয় খৃস্টাব্দ) ভারতবর্ষ হইতে পাট্টিনি দেবীকে আনয়ন করেন। কাণ্ডিতে পাট্টিনি দেবল আছে। কাণ্ডির পেরহেরা উৎসবে পাট্টিনি দেবী বিশেষ সম্মান পাইয়া থাকেন।

পাট্টিনি দেবী সতীত্বের দেবী। গুপ্তভাস্কর্যের ন্যায় বস্ত্রের ভিতর দিয়া শরীরের গঠন দেখানো হইয়াছে। দেহের উপরিভাগ নগ্ন, কোনো অলংকার নাই; মাথায় মুকুট আছে। পিত্তলের মূর্তি। তারিখ ঠিক বলা যায় না।

ব্রোঞ্জের কয়েকটি মহাযান বৌদ্ধ মূর্তি—অবলোকিতেশ্বর, জাম্বল (কুবের), বজ্রপাণি উল্লেখযোগ্য। অবলোকিতেশ্বরের মূর্তি এখন বোস্টন মিউজিয়মে আছে (৩৳ ইঞ্চি উচ্চ)। ডক্টর কুমারস্বামী মনে করেন ইহা সিংহলের সকল মূর্তির মধ্যে শ্রেষ্ঠ। অবলোকিতেশ্বরে পাওয়া যায় গুপ্তযুগের আদর্শ, আর বজ্রপাণিতে পাওয়া যায় পালযুগের আমেজ। কয়েকটি ব্রোঞ্জ বুদ্ধমূর্তি পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে গুপ্তযুগের আদর্শ রহিয়াছে।

চতুর্দশ শতাব্দীর পরে সিংহলে ভাল মূর্তির উদাহরণ দেখা যায় না। তখন ভঙ্গুর পদার্থে মূর্তি নির্মিত হইয়াছে, বহু সহস্র সেসকল মূর্তি ধ্বংস হইয়াছে।

একজন পর্তুগিজের লেখা হইতে জানা যায়, ষোড়শ খৃস্টাব্দে পর্তুগিজেরা দেবুন্দারাতে বিষ্ণু দেবলের এক হাজার মূর্তি ভাঙিয়াছে। মূর্তিগুলি মাটি ও কাঠের, তামার গিল্টি করা ছিল। পাথরের উল্লেখ নাই।

স্টুকো মূর্তি : স্থাপত্যের অলংকরণে প্রচুর পরিমাণে স্টুকো মূর্তির ব্যবহার হইয়াছে।

চিত্র

সিংহলের স্থাপত্য ও চিত্র অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। সিংহলে চিত্র ছাড়া বিহার নাই। বিহারের সমগ্র দেওয়াল, এমনকি ছাদ পর্যন্ত চিত্রে পূর্ণ। বিষয়, বুদ্ধের জীবন এবং জাতক আখ্যান। অষ্টাদশ শতাব্দীর নিদর্শন দাম্বুল বিহারের চিত্রে ঐতিহাসিক বিষয় দেখিয়াছি। প্রাচীন বিহারে সম্ভবত ঐতিহাসিক বিষয়ের রেওয়াজ ছিল না। অষ্টাদশ শতাব্দীর কাজে কোথাও কোথাও সিংহলী জীবনের ছবি দেখিয়াছি, পশুপক্ষীর চিত্র প্রচুর আছে; ফুল লতা পাতা অবলম্বনে আলংকারিক চিত্র যথেষ্ট আছে। আলংকারিক পরিকল্পনায় মনে হয় সিংহলী শিল্পীর একটা স্বাভাবিক দক্ষতা আছে।

চিত্রের প্রাচীনতম উদাহরণ, রুয়ানবেলি দাগোবার ফ্রেস্কো। যৎসামান্য আলংকারিক কাজ অবশিষ্ট আছে। মহাবংশে রুয়ানবেলি দাগোবার ফ্রেস্কোর প্রচুর বর্ণনা আছে, এগুলির কাল হইল ১৫০ খৃস্টপূর্ব।

মহাবংশে বর্ণনা ছাড়া, কোনো চিত্রের যখন নিদর্শন নাই সিগিরিয়ার চিত্রকে তখন (পঞ্চম শতাব্দী) প্রাচীনতম বলা যায়। সিংহলের চিত্রকে চারিভাগে ভাগ করা যায়।

১ যুগের চিত্র সিগিরিয়া ফ্রেস্কো (পঞ্চম শতাব্দী)

২ যুগের চিত্র হিন্ডগালর বিহারের ফ্রেস্কো (সপ্তম শতাব্দী)

৩ যুগের চিত্র পোলানারুয়ার ডেমল মহাসেয়া বিহারের ফ্রেস্কো (দ্বাদশ শতাব্দী)

৪ যুগের চিত্র অষ্টাদশ শতাব্দী হইতে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বিভিন্ন মন্দিরের চিত্রাবলী।

সিগিরিয়ার ফ্রেস্কো অজন্তার চিত্রের মত বিখ্যাত। সিগিরিয়া বা সিংহগিরি নাম সিংহের একটা মূর্তি হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। পাহাড়ের উপরে ইঁটের তৈরি বিরাট এক সিংহের মূর্তি ছিল, বর্তমানে তাহার থাবা মাত্র অবশিষ্ট আছে।

রাজা কাশ্যপ সিগিরিয়া শৈলের উপর দুর্গ-প্রাসাদ নির্মাণ করিয়া পার্শ্ববর্তী জনপদ-সমূহ শাসন করিতেন। আঠার বৎসর (৪৭৯ হইতে ৪৯৭ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত) রাজা কাশ্যপের রাজত্বকাল। পিতা ধাতুসেনকে হত্যা করিয়া সিগিরিয়া দুর্গে কাশ্যপ আত্মরক্ষা করেন, পরে বড়ভাই বিরাট সৈন্যবাহিনী লইয়া আক্রমণ করে। কাশ্যপ নিজের গলা কাটিয়া আত্মহত্যা করেন।

সিগিরিয়া পাহাড় ৮০০ ফুট হঠাৎ খাড়া উঠিয়া গিয়াছে। পাহাড়ের দেওয়ালে ২১টি রমণীমূর্তি আঁকা আছে। ৬৭½ ফুট লম্বা জায়গা লইয়া ২১টি ছবি আঁকা। প্রায় প্রমাণ আকার; কোমর পর্যন্ত আঁকা মূর্তি। কারো উপরিভাগ খোলা, কারো গায়ে টাইট জামা। গায়ে অনেক অলংকার আছে।

সিগিরিয়ার চিত্রের বিষয় লইয়া অনেক বিতর্ক আছে। যেমন—

১ রাণী পরিচারিকাদের লইয়া পূজা দিতে যাইতেছেন।

২ কোমরের নীচে মেঘের মত আঁকা, কাজেই ইহারা মেঘলোকবাসী অপ্সরা। যাহারা অপ্সরা মানিতে চায় না তাহারা বলে, নীচে সমস্ত শরীর আঁকার জায়গা নাই বলিয়া কোমর পর্যন্ত আঁকিয়া ধোঁয়া দিয়া ঢাকিয়া দেওয়া হইয়াছে।

৩ জলকেলি। রমণীরা জলকেলি করিতেছে।

বিষয় যাহা হোক ইহা খুব বলিষ্ঠ চিত্র সন্দেহ নাই। সিগিরিয়ার সৌন্দর্য জোরালো সুনির্দিষ্ট রেখায়। শিল্পী যে রেখা টানিয়া গিয়াছে, তাহাতে কোথাও ভয় বা সন্দেহ নাই। দুই এক জায়গায় ভুল ড্রয়িং আছে, বোঝা যায়, ভুল ড্রয়িংএর উপর কালো লাইন টানিয়া শুদ্ধ করা হইয়াছে। অজন্তায় প্রচুর রং আছে। সিগিরিয়ায় মাত্র তিনটি রং আছে—গেরিমাটি, এলামাটি ও সবুজ রং। যেখানে গভীর রঙের প্রয়োজন, যেমন চোখের তারা চুল ভ্রূ, সেখানে সবুজ রং ব্যবহার করা হইয়াছে।

টেকনিক : পাথরের গায়ে প্রথম একটা আস্তর লাগানো হইয়াছে—মাটির সঙ্গে মেশানো হইয়াছে চীনামাটি, তুষ এবং সম্ভবতঃ নারিকেলের ছোবড়া। এর আধ ইঞ্চি প্রলেপ, তার উপর চূণের প্রলেপ এক ইঞ্চির চতুর্থাংশ পুরু। অজন্তার টেকনিক হইতে বিশেষ ভিন্ন নয়। অ্যানাটমি সম্বন্ধে সিগিরিয়ার শিল্পীর জ্ঞান ছিল। সিগিরিয়ার চিত্র অজন্তা হইতেও বেশি রিয়ালিস্টিক। কলম্বোর জাদুঘরে সিগিরিয়ার উত্তম নকল আছে, মূলের অনুরূপ।

পরবর্তী যুগ : কান্ডির নিকট হিন্ডপালা বিহারের সপ্তম শতাব্দীর ফ্রেস্কো চিত্র। বুদ্ধ-বিষয়ক চিত্র পাহাড়ের গায়ে আঁকা।

সপ্তম শতাব্দীর পর আসিতে হয় একেবারে দ্বাদশ শতাব্দীতে। একমাত্র নিদর্শন দেমল-মহাসেয়ার ফ্রেস্কো চিত্র। এ সময়ের বিহার অধিকাংশই ইঁটের তৈরি। ইঁটের দেওয়ালে আঁকা চিত্র পাথরের উপরে আঁকা চিত্রের মত স্থায়ী হয় না; কাজেই এ সময়ের চিত্র সবই প্রায় নষ্ট হইয়াছে। দেমল-মহাসেয়া বিহারের ছাদ ভাঙিয়া গিয়াছে; তৎসত্ত্বেও রোদ-বৃষ্টির সঙ্গে যুঝিয়া কিছু চিত্র টিকিয়া আছে। অজন্তার প্রতিদ্বন্দ্বী দেমল-মহাসেয়ার চিত্র চিরতরে লুপ্ত হইয়া গেল।

আর্কিয়োলজিকাল রিপোর্টে লেখা হইয়াছে—পোলানারুয়ার মধ্যযুগের এই বিহারে যেমন আশ্চর্য রকমের বৌদ্ধচিত্র রহিয়াছে, অন্তত যেসব বিহার এখনও বর্তমান আছে, সিংহলের অন্য কোথাও প্রাচীন বিহারে খুব সম্ভবত ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নিদর্শন আর নাই। সাঁচি, বারহুত, অমরাবতী, বরভূধর প্রভৃতি স্থানের পাথরের খোদাই যে অসম্পূর্ণ বস্তু দেয়, তাহাই এখন রঙীন চিত্রে স্বাভাবিকভাবে নিপুণ তুলিকার অঙ্কনে সব আখ্যান যথার্থ স্পষ্টভাবে বলিতেছে। দেমল-মহাসেয়াতে এমন সকল চিত্র আছে, যাহা অজন্তার শ্রেষ্ঠ চিত্রসমূহের প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারে।

ইহাতে কিছুই অত্যুক্তি নাই; আমি এই চিত্র দর্শন করিয়া স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলাম।

শেষ যুগের চিত্র, যা অষ্টাদশ শতাব্দী হইতে আরম্ভ হইয়াছে, তা খুব কনভেনশনাল, উহার ভিতরে জীবনের গতি নাই। কিন্তু ইহার ভিতর আলংকারিক দিকটা পুরাপুরি আছে। শিল্পীদের বংশানুক্রমিক একটা স্বাভাবিক বৃত্তি আছে; যাতে তারা অতি সহজেই কৃতকার্য হয়। দেওয়ালের সমস্ত জমিতে চিত্র এবং তার ফাঁক (space) ঠিকভাবে ভাগ করা আছে। ছবির সৌন্দর্য অনেক পরিমাণে এই ফাঁকের উপর নির্ভর করে। ফাঁকই ছবির বিভিন্ন অংশের সমান ওজন রাখিয়া ছবিটিকে সংহত করে।

এযুগের মানুষের চিত্রে দেখা যায় মাপজোখ ঠিক নাই; প্রাচীন মিশরীয় চিত্রের ন্যায় আড়ষ্ট। দেহের সৌন্দর্যের দিকে কোনো দৃষ্টি দেয় নাই। দেহের চিত্রের সঙ্গে বারহুতের রিলিফের সাদৃশ্য আছে। যাই হোক, এ চিত্রে মানুষের অ্যানাটমি ঠিক না।

হইলেও ভুলটা চোখে পড়ে না; কারণ চিত্রের বিশেষ কোনো বস্তুর বা বিশেষ কোনো অংশের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব অনুভূত হয় না। যদি কোনো এক অংশে দৃষ্টিপাত না করিয়া সমগ্রটা একেবারে দেখা যায়, তবে বুঝা যাইবে, সমগ্র দেওয়ালের বিভিন্ন চিত্র ডুবিয়া গিয়া একটা নকশা চিত্রে পরিণত হইয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর চিত্রে আছে story telling quality—গল্প বলার শক্তি।

এ যুগের শিল্পীদের বলা যাইতে পারে কারিগর। সিগিরিয়া ও দেমল-মহাসেয়া যারা আঁকিয়াছে, তারা আর্টিস্ট। এ যুগের শিল্পীদের বাঙলার পোটোদের সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে; তবে সিংহলের চিত্রকরেরা বাঙলার পোটোদের হইতে অনেক শ্রেষ্ঠ।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ চিত্র হইল রিদিবিহার ও দেগাল-দরুয়ার চিত্র। বিষয় জাতক চিত্র। বেস্‌সান্তর জাতকের কাহিনী অধিকাংশ বিহারেই দেখা যায়। আর উদাহরণ—দানাগিরিগাল, ডোডানটাল বিহার, পাহাড়ের গুহার ছাদে আঁকা ডাম্বুল বিহারের চিত্র, মাতালের আলু-বিহার (আলোক বিহার)। ত্রিপিটকের বিখ্যাত টীকাকার বুদ্ধ ঘোষ এই বিহারে বাস করিয়াছিলেন। তিনি উত্তরভারত হইতে পঞ্চম শতাব্দীতে সিংহলে আসিয়াছিলেন। তাঁর প্রভাবে সিংহলে বৌদ্ধধর্মের পুনর্জাগরণ হয়।

কাণ্ডির বিহার—দালদামালিগাওয়া (দন্ত বিহার, বুদ্ধের দন্ত এখানে রক্ষিত আছে), আশগিরিয়া বিহার, আদাহন মালুয়া বিহার, লঙ্কাতিলক বিহার।

সমুদ্রের তীরবর্তী কয়েকটি বিহার—কালুতারা, হিক্কাডুয়া, ডোডানডুয়া, আহাঙ্গমার বিহার।

এটা খুব আশ্চর্য যে, দেশের লোকেরা এবং ভিক্ষুরা এসকল প্রাচীন চিত্রের মর্যাদা বোঝেন না। তাঁরা প্রাচীন চিত্র তুলিয়া ফেলিয়া তার জায়গায় জমকাল কুৎসিত রঙের আধুনিক চিত্র আঁকাইয়া থাকেন, কাণ্ডি অঞ্চলে এখনো সাবেকী ধরনের বংশানুক্রমিক শিল্পী পাওয়া যায়। তারা এখন মন্দিরে কাজ পায় না। মন্দিরে চিত্র আঁকার জন্য এসকল চিত্রকরদের স্বাধীন সিংহলে যথেষ্ট চাহিদা ছিল।

টেকনিক : অষ্টাদশ শতাব্দীর চিত্র ফ্রেস্কো নয়, টেম্পারা পেণ্টিং। রঙের সঙ্গে গাছের আঠা মিশাইয়া লওয়া হয়।
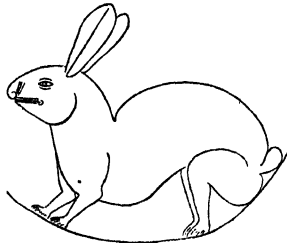
রাষ্ট্র ও শিল্প
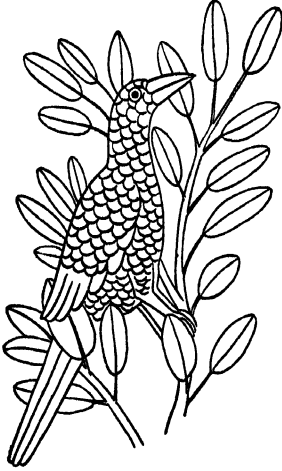
চতুর্দশ শতাব্দীর পর হইতে সিংহলের শিল্প প্রাদেশিক ও লোকশিল্পে পরিণত হইয়াছে; কিন্তু এতবড় লোকশিল্প সম্ভবত পৃথিবীতে হয় নাই। স্থাপত্য ভাস্কর্য চিত্র, এমনকি গৃহের আসবাবপত্র, তৈজস সকলই শিল্প-নৈপুণ্যের পরিচায়ক। একটা সামান্য নারিকেলের মালা খোদাই করিয়া শিল্পী অপূর্ব সৌন্দর্য-মণ্ডিত করিয়াছে। শিল্পীর সময় ছিল অফুরন্ত, তার অন্নবস্ত্রের অভাব ছিল না; রাষ্ট্র তার ভার নিয়াছিল।

বাজারে ব্যবসায়ের জন্য শিল্পী তার শিল্প-দ্রব্য গড়ে নাই। সিভিল সার্ভিস বা রাজকার্যে তার নির্দিষ্ট স্থান ছিল। রাজা তাহাকে বংশানুক্রমিক ভূমিদান করিয়া, অর্থদান করিয়া অন্নচিন্তা হইতে নিষ্কৃতি দিয়াছেন; সেজন্য তাহাকে প্রতিযোগিতার বাজারে লড়িতে হয় নাই। বংশানুক্রমে শত শত বৎসর ধরিয়া শিল্পী তাহার পৈতৃক ব্যবসায় চালাইয়া আসিয়াছে। জাতি হিসাবে এ কার্য চলিয়াছে। অফুরন্ত ভালোবাসা ও ধৈর্য সহকারে শিল্পী তাহার কাজ করিয়াছে। সিংহলে প্রবল পরাক্রান্ত সম্রাট ছিল, দরবার ছিল, কিন্তু মোগল আমলের ন্যায় দরবারী শিল্প গড়িয়া ওঠে নাই! কেননা রাজা শিল্পের পোষকতা করিয়াছেন, ধর্মের জন্য, জনগণের জন্য—"It was the art of a people whose kings were one with religion and the people."—রাজা জনগণ ও ধর্মের সঙ্গে এক ছিলেন।

রাজারা কি করিয়া শিল্পীদের সম্মান করিতেন, পারিশ্রমিক দিতেন, তাহার কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। চতুর্দশ শতাব্দীতে ভুবনেকাবাহু কোট্টেতে রাজত্ব করিতে-ছিলেন। তিনি শুনিতে পাইলেন, মানদুয়াতে ভারতবর্ষ হইতে একজন ওস্তাদ শিল্পী আসিয়াছেন। তিনি তখনি শিল্পীকে হাতীতে করিয়া আনিবার জন্য একজন কর্মচারী পাঠাইলেন। রাজসভায় উপস্থিত হইলে শিল্পী রাজাকে একটি দূরবীন এবং সময় দেখিবার জন্য একটি যন্ত্র উপহার দিলেন। রাজা তাহাকে যথেষ্ট উপহার দিলেন, 'মঙ্গলগাম' দান করিলেন এবং 'মণ্ডলাবল্লিনায়াড' উপাধি দিলেন। মণ্ডলাবল্লিনায়াড বংশপরম্পরা রাজ-অনুগ্রহ পাইয়া আসিতেছে। এখনো এই শিল্পীর বংশধরেরা 'মঙ্গল-গামে' বাস করিয়া পৈতৃক কারুশিল্পের কাজ করিয়া যাইতেছে।

যখন ১৫১৫ শকে ওয়েসাক (বৈশাখ) মাসে বৃহস্পতিবার পূর্ণিমা দিনে জেতবনরাম সমাপ্ত হইয়াছিল, মহারাজা বিমলধর্ম সূর্য পুণ্য অর্জন করিয়া আনন্দিত হইলেন এবং বংশানুক্রমে ভোগ করার জন্য উম্নানদুপিটিয়ার চিত্রকর রাজেশ্বর ছিণ্ডারা আচারিয়াকে দান করিলেন একটি বাগান এবং তিনহেনা জমি।

কীর্তিশ্রীর রাজত্বকালে গন্নোরুয়া মুহন্দিরাম ওস্তাদ স্বর্ণকার ছিলেন। তিনি রাজার প্রাসাদে কাজ করিতেন। রাজা তাহাকে জমি অর্থ হাতী দান করিয়াছিলেন।

দুট্ঠগামিনি রুয়ানবেলিদাগোবা নির্মাণকালে শিল্পীদের প্রচুর অর্থদান করিয়াছিলেন। তিনি সাবধান ছিলেন, কেউ বিনা অর্থে গোপনে কাজ না করিয়া যায়, কেননা, তাহাতে রাজার ভাগ্যে পুণ্য কম পড়িয়া যাইবে।

রাজা কাহাকেও সম্মান দিতে ইচ্ছা করিলে রাজকীয় পোশাক ও পাগড়ি দান করিতেন। কাণ্ডি অঞ্চলে কোনো কোনো কারিগর পরিবারের অধিকারে এরূপ রাজকীয় পোশাক এখনো দেখা যায়। তাহাদের পূর্ব-পুরুষ কেহ হয়তো রাজা হইতে খেলাত লাভ করিয়াছিলেন, তাহা সগৌরবে বংশানুক্রমে রক্ষা করিয়া আসিতেছে।

রাজা দ্বিতীয় জেঠ্‌টা তিস্‌স (৩৩২—৩৩৯ খৃস্টাব্দ) নিজেই একজন শিল্পী ছিলেন। তিনি নিজে অনেক শ্রমসাধ্য চিত্র ও ভাস্কর্য করিয়াছিলেন এবং প্রজাদের শিখাইয়াছিলেন।

পর্টুগীজ, ডাচ ও বৃটিশ যুগে বৈদেশিক প্রভাব সিংহলের শিল্পে পড়িয়াছে, কিন্তু এসব সত্ত্বেও কয়েকজন শিল্পী প্রাচীন পদ্ধতিকে জীয়াইয়া রাখিয়াছে। তাহারা যে সরকার বা দেশের লোক হইতে উৎসাহ পাইয়াছে তাহা নহে, স্বজাতীয় কারুকর্মে নিতান্ত নিষ্ঠা ও ভালোবাসা আছে বলিয়াই বর্তিয়া আছে।

কারিগর জাতির সংখ্যা : বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে আদমসুমারীতে দেখা যায়— কাণ্ডি প্রদেশের জনসংখ্যার শতকরা চারজন করিয়া কারিগর জাতির। অষ্টাদশ শতাব্দীতে অনুমান করা যাইতে পারে, কারিগর জাতির সংখ্যা (পরিবারস্থ সকলকে ধরিয়া) অন্ততঃ শতকরা দশজন ছিল।

বিশ্বকর্মা : বিশ্বকর্মা কাম্মালারদের পূর্বপুরুষ। ইনি শিল্প এবং কারুকলার ইষ্টদেবতা। কাম্মালার হইল উচ্চশ্রেণীর কারিগর। পাঁচ রকমের উচ্চশ্রেণীর কারুশিল্প কাম্মালারদের মধ্যে প্রচলিত। ১. চিত্র, ২. হাতীর দাঁতের কাজ, ৩. কাঠ খোদাই, ৪. সোনা রূপা, পিত্তল ইত্যাদি ধাতুর কাজ, ও ৫. জহুরি। এইসব শিল্পকার্য কাম্মালারদের জানা থাকিত।

বিশ্বকর্মা মানুষের নির্মাণকার্যে সাহায্য করেন। রাজা এক শিল্পীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি চৌতিয়কে (চৈত্য) কোন্‌ আকার দান করিবে?' বিশ্বকর্মা সেই মুহূর্তে শিল্পীকে প্রেরণা জোগাইলেন। শিল্পী স্বর্ণপাত্রে জল লইল, হাতের চেটোতে জল লইয়া ছুঁড়িয়া মারিল, জলের মধ্যে বুদ্‌বুদ ফুটিয়া উঠিল। শিল্পী বলিল, 'এই আকারে নির্মাণ করিব।' রাজা সন্তুষ্ট হইলেন, তাহাকে এক হাজার কাহাপন (কার্ষাপণ) মূল্যের একপ্রস্থ পোশাক এবং বারো হাজার কাহাপন (মুদ্রা) দান করিলেন।

সিংহলীদের শিল্পশাস্ত্র 'রূপাবলিয়'তে বিশ্বকর্মার রূপবর্ণনা আছে—'বিশ্বকর্মাকে প্রণাম করি। তিনি গৌরবর্ণ, মহান্‌, বিখ্যাত ও স্বাধীন—যাঁহার তিলকযুক্ত পঞ্চমুখ আছে।

তিনি ধারণ করিয়া আছেন পুস্তক, লেখনিয়া (তালপাতায় লিখিবার লৌহশলাকা), তরবারী, গদা, লেবু বাটী, জলপাত্র, জপমালা, গোখুরা মালা (গলদেশে) এবং পাশ। হাতে রুদ্র এবং আশীর্বাদের ভঙ্গী (একটি হাত বন্ধ, অপরটি খোলা) এবং ধারণ করিয়া আছেন সোনার যজ্ঞোপবীত।'

বিশ্বকর্মার কোনো পূজার বিধি নাই। কিন্তু কারিগরেরা গৃহনির্মাণকালে বিশ্বকর্মার উদ্দেশ্যে মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া থাকে; যাহাতে কোনো অমঙ্গল না হয় এবং নির্বিঘ্নে নির্মাণকার্য শেষ হয়।

শিল্পশাস্ত্র : কারিগরেরা তাহার পুত্রকে শিক্ষা দিয়া থাকে। ঠিক জাত হইলে বাহিরের ছাত্রকেও গ্রহণ করে। ছয় বছরের সময় দিনক্ষণ দেখিয়া শিল্পারম্ভ হয়। প্রথম শিখিতে হইবে ফুলপাতা অবলম্বনে আলংকারিক ড্রয়িং। পরে আঁকিতে হইবে সংযুক্ত ষাঁড়হাতী (উসম্ব কুঞ্জর), চতুর্নারী পাল্কী (চতুর্নারী পালাক্কিয়া), ছয়-নারী তোরণ, সপ্তনারী তোরণ, অষ্টনারী বক্ষ, সপ্তনারী তুরঙ্গ, নব-নারী কুঞ্জর ইত্যাদি। লক্ষ্য করা যাইতে পারে—এ-জাতীয় চিত্র বাঙলা পটচিত্রেও আছে। প্রচলিত আলংকারিক ও ফিগার-ড্রয়িং শেষ হইলে মুখস্থ করিতে হইবে শিল্পশাস্ত্র, যথা—রূপাবলিয়, সারিপুত্র এবং বৈজয়ন্তয়। কোনো কারিগর পাঁচটি কারুকর্মে দক্ষ হইলে শিল্পাচার্য বলিয়া অভিহিত হইবে।

রূপাবলিয় : কান্ডির চিত্রকরেরা সংস্কৃতে শিল্পশাস্ত্র রূপাবলিয়ের বিধির উপর কতকটা নির্ভর করিয়া থাকে। সিংহলে যাহা প্রচলিত আছে, তাহা অসম্পূর্ণ ও ভ্রমপূর্ণ। ইহাতে আছে দেবদেবীর ধ্যান, রূপবর্ণনা ও পরিমাপ। নাথদেবিয়ো, অষ্টনাম, দশ অবতার, ষোল প্রকার সিংহ, হংসরূপ, অশ্বয়, লতা, কিন্নর ও মকর। জগদেকমাতার ধ্যান এইরূপ—'পৃথিবীর একমাত্র মাতার বন্দনা করি, যাঁহার চার হাত-পা আছে, যাঁহার কপালের রক্ত চন্দ্র, যাঁহার উন্নত বক্ষ, যিনি সোনার মত উজ্জ্বল, যাঁহার হাতে আছে নির্মল শ্বেতপদ্ম, অঙ্কুশ এবং ফুলের মালা।' পরিমাপ সম্বন্ধে আছে—'পরিমাপ সম্বন্ধে বর্ণনা করিয়াছি, পৃথিবীতে যে উচ্চতা ও দৈর্ঘ্য, তা দেওয়া হইয়াছে। দেহের আকার ও পার্থক্য বলা হইয়াছে। ব্রহ্ম ও পৃথিবীর অন্যান্য অধিপতি, সর্বজ্ঞ, দেবতা, অসুর, দানব, রাক্ষস, যক্ষ, নাগ, গরুড়, কিন্নর, ভূত, খুম্ভান্ড (?) এবং সেই সঙ্গে মানুষ বাচ্য চতুষ্পদ জন্তু এবং পাখীরও পরিমাপ দেওয়া হইয়াছে।'

মূর্তি-নির্মাণে মাপের ভুল হইলে কি হইবে?—'মূর্তি-নির্মাণে মাথার (মাপের) কমতি হইলে পিতামাতার মৃত্যু হইবে; পিঠের হইলে গোষ্ঠীর ধ্বংস হইবে; গলার এবং দুই পায়ের হইলে স্ত্রীর মৃত্যু হইবে; যদি সব কিছুর কমতি হয়, সব ধ্বংস হইবে।'

সারিপুত্র : মূর্তি-নির্মাণে (ভাস্কর্যে) বিশেষ করিয়া বুদ্ধমূর্তি-নির্মাণে সিংহলের শিল্পীরা সারিপুত্র নামক শিল্পশাস্ত্রের নির্দেশ মানিয়াছে। এই শিল্পশাস্ত্রখানি সংস্কৃত ভাষায় রচিত। সিংহলী শিল্পীরা সংস্কৃত জানে না বলিয়া অনেকস্থলে ইহা বিকৃত হইয়াছে। গ্রন্থকারের নামানুসারে ইহারও নাম সারিপুত্র হইয়াছে। কোনো পুঁথির সিংহলী ভাষার টীকায় আছে, ১১৬৫ খৃস্টাব্দে রাজা সর্বজ্ঞ পরাক্রমবাহু লঙ্কার সিংহাসনে আরোহণ করিলে ডিম্বলগালর (ডাম্বুল) মহাথেরা কাশ্যপের এক শিষ্যের হাতে অনুবাদের ভার দিয়াছিলেন শিল্পীদের নির্দেশ দেওয়ার জন্য।

বুদ্ধের বন্দনা করিয়া তাহার পরিমাপ দেওয়া হইয়াছে—'শোন এখন বুদ্ধের তিন ভঙ্গির পরিমাপের বর্ণনা করিব—বসা, দাঁড়ান এবং শোওয়া।'

বুদ্ধের মূর্তি নির্মাণ হয় সোনা, তামা, মাটি, পাথর, কাঠ, পোরামাটি এবং চূণ দিয়া।

বৈজয়ন্তয় : বৈজয়ন্তয় কারুশিল্পের গ্রন্থ। ৬৪ প্রকার অলংকারের পরিচয় আছে। দেবতা রাজা এবং মানুষের বিভিন্ন প্রকারের অলংকার। প্রত্যেক অলংকারে কত ওজনের সোনা লাগিবে, তাহার উল্লেখ আছে ও তাহার নকশা আছে। তরবারী সিংহাসন ও দাগোবার মাপ দেওয়া আছে।

মায়ামাতায়া : 'মায়ামাতায়া' আর-একটি শিল্পশাস্ত্র। ইহা স্থাপত্য ও জ্যোতিষাদি গণনাবিষয়ক গ্রন্থ। সিংহলী কারিগরগণ দিনক্ষণ দেখিয়া কাজ শুরু করে। গৃহনির্মাণে কিসে মঙ্গল-অমঙ্গল হয়, ইহাতে লিপিবদ্ধ আছে। মূল রচনা সংস্কৃতে। ১৮৩৭ খৃস্টাব্দে সিংহলী ভাষায় ইহার অনুবাদ হয়।

সংগীত ও সাহিত্য

সিংহলের মত সংগীত-বর্জিত দেশ পৃথিবীতে আছে কিনা সন্দেহ। ইহা হীনযান বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে হইয়াছে। সিংহলী গোঁড়া বৌদ্ধ-পরিবার সংগীতচর্চা পছন্দ করে না। ব্রহ্মদেশ হীনযান মতাবলম্বী হওয়া সত্ত্বেও সেখানে সংগীত নৃত্য অভিনয়ের প্রচুর প্রচলন আছে। মহাযান মতাবলম্বী যবদ্বীপ, চীন, জাপানে সংগীত নৃত্য অভিয়নাদির যথেষ্ট উৎকর্ষ হইয়াছে।

সংগীতের কিছু রেশ পাওয়া যায় কান্ডি প্রদেশে। রাগরাগিণী-যুক্ত উচ্চাঙ্গের সংগীত ইহাকে বলা যায় না। ইহা একটানা সুরের লোকসংগীত।

কৃষক তার ক্ষেতে কাজ করিতে করিতে গান করিতেছে—'রায়িগাম কোরালে জন্মেছিল এক বিখ্যাত তালগাছ, এত সুন্দর যে, তার বর্ণনা করা যায় না; সুন্দর ছিল তার মুকুট, গ্রাম থেকে গ্রামে ছিল তার পরিচয়। ফরসা রঙের তালের ফুল ফুটল, যেন পদ্মের পাপড়ি ফুটে উঠল গাছের উপর।'

শস্য মাড়াইবার সংগীত—'হে ষন্ডরাজ দলপতি, হে ভেরিয়ো, যে তার নীচে আছে কালাটা বাছুর, তাড়াতাড়ি করে শস্য মাড়ান শেষ কর, তোমার দুই শিঙ সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে দেব, কানে দোলাব মুক্তা, ক্ষুরেও দেব গয়না,' ইত্যাদি।

বর্তমানে ভারতবর্ষে ছাত্র পাঠাইয়া ভারতীয় সংগীত শিক্ষা করার রেওয়াজ চলিতেছে। লক্ষ্ণৌর মিউজিক কলেজে ও শান্তিনিকেতনের সংগীত-ভবনে কয়েকটি সিংহলী ছাত্র ও ছাত্রী সংগীত ও নৃত্য শিক্ষা করিয়াছেন। স্বর্গীয় স্যার জেমস্ পিরিরিসের পুত্র সূর্য সেন ইউরোপীয় সংগীতে পারদর্শী। তিনি কান্ডিয়ান লোকসংগীতের চর্চা করিয়াছেন। কিছুকাল শান্তিনিকেতনে বাস করিয়া রবীন্দ্র-সংগীত শিক্ষা করিয়াছেন। তিনি সিংহলে রবীন্দ্র-সংগীতের প্রচারে উদ্‌যোগী।

প্রাচীন ইতিহাসে সংগীতের উল্লেখ দেখা যায়। পরাক্রমবাহুর সংগীত ও নৃত্যশালা ছিল। দুটুঠগামিনী যখন যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন, তখন সঙ্গে ৬৪ প্রকার ঢাক ছিল। রাজকুমারদের ১৮ প্রকার বিজ্ঞান শিখিতে হইত, তাহার ভিতর সংগীতের স্থান ছিল।

লোক-নৃত্য : আমার মনে হয়, কাণ্ডি নৃত্যের সঙ্গে দক্ষিণভারতের কথাকলি নৃত্যের সম্বন্ধ আছে। হয়তো দক্ষিণভারতীয় নৃত্যরীতি কোনো সময় সিংহলে প্রবেশ করিয়াছে। কাণ্ডি প্রদেশে তিন প্রকার নৃত্য দেখা যায়—১ কান্তারু, ২ উর্ডেক্কি, ৩ কাঙ্কেরি—এই নৃত্যের মধ্যে কান্তারু নৃত্যই হইল সিংহলের শ্রেষ্ঠ নৃত্য। এই নৃত্যে হাতে থাকে রিং, পায়ে থাকে ঘুঙুর (গিরিরি বললু)। নাচের সময় যুগপৎ হাতের রিং পায়ের ঘুঙুর হইতে শব্দ হইতে থাকে। নর্তকের গায়ে কোনো কাপড় নাই। প্রচুর গহনায় গা ঢাকা থাকে। কান্তারু নৃত্যের সঙ্গে গান চলিতে থাকে। এই নৃত্যের জন্য বহু গান আছে; সব গানই প্রাচীন কাল হইতে এখন পর্যন্ত চলিয়া আসিতেছে। কোনো গানই নূতন রচনা নহে। অধিকাংশ গানই কাণ্ডির রাজা রাজাধিরাজের সময় হইতে চলিয়া আসিতেছে, তিনি নিজেও অনেক গানের রচয়িতা। গানের উদ্দেশ্য ত্রিরত্ন, অর্থাৎ বুদ্ধ ধর্ম ও সংঘকে নমস্কার ও রাজার গুণগান করা।

উর্ডেক্কি নৃত্যে হাতে ডমরু থাকে, কাঙ্কেরি নৃত্যে হাতে কিছু থাকে না। কাণ্ডির সব নৃত্যই বীররসোচিত।

পেরহেরা ও অন্যান্য ধর্মানুষ্ঠানের সঙ্গে নৃত্যের সম্বন্ধ। এমনি শুধু আমোদ-প্রমোদের জন্য নৃত্যের স্থান নাই। সিংহলে মেয়েদের নৃত্যের চল্ নাই, তাহা বলাই বাহুল্য। আমাদের দেশে দেবদাসী, নাচওয়ালি মেয়ে আছে, সিংহলে সেরূপ নাই।

সাহিত্য : সিংহলের ভিক্ষুরা ছিল সকল জ্ঞানবিজ্ঞানের আধার; কাজেই সাহিত্যসৃষ্টি তাহাদের দ্বারাই হইয়াছে। পালি, সংস্কৃত, মাতৃভাষা—তিন ভাষার চর্চাই তাঁহারা করিয়াছেন। ধর্মসম্বন্ধীয় সকল প্রকার লেখাই হইল পালি ভাষায়। পালি ভাষায় ইতিহাস গ্রন্থ মহাবংশ ও দীপবংশ অমূল্য। একমাত্র চীন ছাড়া প্রাচ্য ভূখণ্ডে ইতিহাস সেবায় কোনো জাতি সিংহলীদের সমকক্ষ নহে। জ্যোতিষ, গণিত, পদার্থবিদ্যার গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায়। প্রাচীন পুঁথি সকল তালপাতায় (ওলা) লেখা। রাজা বিহারে লাইব্রেরী স্থাপনে উৎসাহ দিয়াছেন। বর্তমানেও তালপাতার ব্যবহার আছে; ঠিকুজি আধুনিক কালেও তাল-পাতায় লেখা হইয়া থাকে। গ্রামের পাঠশালায় আমরা যেমন কলাপাতায়, তালপাতায় লিখি, সিংহলী বালকেরাও তেমনি তালপাতায় লিখিয়া থাকে।

পালি ও সংস্কৃত ভাষার তুলনায় সিংহলী ভাষার গ্রন্থ আধুনিকতম। প্রাচীন সিংহলী ভাষাকে বলা হয় এলু, ইহা পালি ও সংস্কৃত মিশ্রিত। উচ্চাঙ্গের যা-কিছু, তা সংস্কৃত ও পালি ভাষায়ই হইয়াছে। সেজন্য সিংহলী ভাষায় উল্লেখযোগ্য কিছুই নাই। Ballad বা গাথা জাতীয় কিছু আছে, তা নিতান্তই লোকসাহিত্য। রাজাবলি এবং রাজরত্নাচারিতে কিছু ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায়।

আধুনিককালে, যদিও ইংরেজদের আমলে উচ্চশিক্ষা পাইতেছে, তাহাদের সাহিত্যের উন্নতি হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না, কারণ ইংরেজি শিক্ষিতদের ভিতর দেশীয় ভাষার চর্চা নাই। শহরে দেখিয়াছি তাহারা নিজেদের ভিতর ইংরেজিতে কথা বলে এবং মাতৃভাষার চর্চা তো করেই না, পরন্তু নিজেদের ভাষার উপর তারা আস্থাহীন। তাহারা বাহিরে ভিতরে মনে প্রাণে পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন, সেজন্য সরোজিনী নাইডু সিংহলকে Little England বলিয়া আখ্যা দিয়াছিলেন।

সমাজ

ব্যক্তিবিশেষের নাম হইতে তার দেশ বোঝা যায়। কিন্তু সিংহলীদের নাম হইতে দেশের পরিচয় পাওয়া যায় না, কারণ পর্তুগিজ ডাচদের আমল হইতে খৃস্টানদের অধীনে বাস করিয়া সিংহলীদের নিজেদের নামগোত্র বদলাইতে হইয়াছিল। খৃস্টান শাসনকর্তা সিংহলীদের জোর করিয়া খৃস্টধর্মে দীক্ষিত করিয়া খৃস্টানি নাম রাখিতে বাধ্য করিয়াছে। যারা খৃস্টধর্ম গ্রহণ করে নাই, এমন হাজার হাজার লোকের প্রাণদণ্ড হইয়াছে। অবশ্য এসব হইয়াছে "লো কাণ্ট্রি সিংহলিজ" অথবা সমুদ্রতীরবর্তী সিংহলীদের মধ্যে। "আপকাণ্ট্রি সিংহলিজ" বা পার্বত্য অঞ্চলের সিংহলীদের এসব পরিবর্তন ঘটে নাই; কারণ সুরক্ষিত পার্বত্য প্রদেশে তাহাদের স্বাধীনতা ও ঐতিহ্য অক্ষুণ্ণ ছিল।

সিংহলীদের নামের নমুনা: টমাস পেরেরা, জন ফার্নাণ্ডো, হেনরি ডি সিল্‌ভা ইত্যাদি পর্তুগিজ নাম। আমাদের বোম্বাই অঞ্চলের গোয়ানিজদের মত। এসব বিদেশী নাম দেখিয়া কেউ মনে না করেন যে এঁরা খৃস্টান। এঁরা খৃস্টান নন্, অধিকাংশই বৌদ্ধ। ধর্মে বৌদ্ধ হইলেও নামটা খৃস্টানি ধরনেই চলিয়াছে।

কারো কারো নামের সঙ্গে 'ডন' শব্দ দেখা যায়—ইহা সম্মানসূচক। পর্তুগিজরা অর্থের বিনিময়ে এই সম্মানসূচক উপাধি বিক্রয় করিত। কয়েকশত ডলার মূল্য পাইলেই 'ডন' শব্দ বিক্রী করা হইত। পর্তুগিজ সরকার 'ডন' শব্দ বিক্রী করিয়া প্রভূত অর্থ উপার্জন করিয়াছে। রূপার পাতে 'ডন' শব্দ যোগে ব্যক্তির নাম খোদাই থাকিত। হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া এই সম্মান গ্রহণ করিতে হইল। গভর্নর এই রৌপ্যপদক কপালে বাঁধিয়া দিয়া বলিত "ডন অমুক, ওঠো"।

ডাচেরা আসিয়া এই উপাধি খুব সস্তায় ছাড়িয়াছে; বিশ ডলারেই দিত, এমনকি দশ ডলারেও দিয়াছে।

দেশী নামের যে রেওয়াজ নাই তাহা নহে। দেশী নামের নমুনা : জয়সেন, জয়তিলক, জয়সিংহ, গুণসিংহ, সেনানায়ক, বিজয়তুঙ্গ, কুলরত্ন ইত্যাদি। কান্ডি প্রদেশে প্রচলিত নাম : পুণ্ডি বান্ডা, রণরাজ, বান্ডারনায়ক ইত্যাদি। অনেকে ইউরোপীয় নাম বদলাইয়া দেশী নাম রাখিতেছে। খবরের কাগজে এরূপ নোটিশ চোখে পড়িতে পারে—"আমার নাম টমাস ফার্নাণ্ডো ছিল, অদ্য হইতে আমার নাম সিরিসেন (শ্রীসেন) জয়সিংহ; এতদ্দ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে, অতঃপর আমি এই নামেই অভিহিত হইব।"

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, শ্রাদ্ধ : সিংহলে সাধারণত দেহ মাটিতে সমাহিত করা হয়, সেটা আর্থিক কারণে। যারা খুব সঙ্গতিপন্ন, তারা খুব ঘটা করিয়া দাহ করে, মিছিল করিয়া ব্যান্ড বাজাইয়া শ্মশানে লইয়া যায়। পুরোহিত অর্থাৎ বৌদ্ধ ভিক্ষু শ্মশানে মন্ত্র উচ্চারণ করেন।

মৃতদেহ আমাদের দেশের মত সিংহলীরা কাঁধে করিয়া বহন করেন না। খৃস্টানদের মত ঘোড়ার গাড়িতে করিয়া লইয়া যাওয়া হয়। কাহারও মৃত্যু হইলে হাতে কালো ফিতা বাঁধা হয়। এই অনুষ্ঠান প্রাচীন সিংহলী অনুষ্ঠান, অথবা খৃস্টানদের নিকট হইতে পাওয়া, তাহা বলিতে পারি না।

সিংহলে আমাদের মত অন্নপ্রাশনের চলন আছে, বিশেষ দিনে, "ভাত খাওয়ানো" হয়।

জাতিবিভাগ

বৌদ্ধধর্ম সকল মানুষের সাম্য স্বীকার করিলেও বৌদ্ধ সিংহলে জাতিভেদের প্রভাব কম নয়, অবশ্য সেটা ভারতবর্ষের মত তেমন প্রবল নয়। প্রাচীন সিংহলে ছিল চারিটি জাতি—রাজ, বামুন, বেলন্দ ও গবি। রাজ হইল রাজার জাতি, আমাদের দেশের ক্ষত্রিয়ের তুল্য। বামুন হইল রাজাকে যারা মন্ত্রণা দিয়া থাকে—ভারতের ব্রাহ্মণের তুল্য; এটা লক্ষ্য করার বিষয়, হিন্দুর ন্যায় ব্রাহ্মণ প্রধান, ক্ষত্রিয় পরে—সেরূপ নহে; বৌদ্ধদের শ্রেণীবিভাগ অনুসারে ক্ষত্রিয় প্রধান, ব্রাহ্মণ পরে। বেলন্দ হইল যারা বাণিজ্য করিয়া থাকে, আমাদের বৈশ্যের তুল্য। গবি হইল যারা কৃষিকর্ম করিয়া থাকে।

মাদ্রাজে এরূপ জাতি আছে, বলে বেল্লালা। "চাকরেরা জাতে হচ্ছে প্রায়ই বেল্লালা—দ্রাবিড় দেশের একশ্রেণীর সৎ চাষী জাত; তাদের তামিল জাতের স্তম্ভস্বরূপ বলা হয়।"[১]

প্রাচীন কালের চারি জাতের ভিতর তিন জাতি অন্তর্ধান করিয়াছে। বর্তমানে শেষ জাতি আছে, তারা এখন বেল্লাল বা গয়িগাম নামে পরিচিত।

সিংহলের অনেক বিখ্যাত পরিবার গয়িগাম শ্রেণীর অন্তর্গত। স্বর্গীয় মন্ত্রী স্যার ডি. বি. জয়তিলক ও সিংহলের নেতৃস্থানীয় সেনানায়ক পরিবার এই জাতির অন্তর্গত। গয়িগামর পরেই প্রধান জাতি করাভ। সমুদ্রতীরবর্তী প্রদেশে ইহাদের বাস, প্রধানত ইহারা মৎস্যজীবী। এই জাতির ভিতরেও অনেক বিখ্যাত লোক আছেন। যেমন, স্বর্গীয় স্যার

১ দ্বীপময় ভারত। ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। পৃ ২৪

জেমস পিরিস,* ইনি সিংহল ব্যবস্থাপক-সভার সভাপতি ছিলেন; মন্ত্রী স্বগীয় আর্থার ডি. সিলভা একজন খ্যাতনামা ব্যক্তি ছিলেন। গয়িগাম এবং করাভ সম্প্রদায়ের মধ্যে একটু রেষারেষি লক্ষ্য করা যায়। এক জাতি অন্য জাতির সহিত সংস্রব করিতে চায় না, এবং দুইই জাতি হিসাবে প্রাধান্য দাবি করে। করাভরা নিজেদের ক্ষত্রিয় বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চায়; কিন্তু গয়িগামরা বলে করাভ মৎস্যজীবী জাতি; করাভ জাতি কৈবর্ত শব্দ হইতে আসিয়াছে।

এই দুই প্রধান জাতির পর অন্যান্য জাতি।—

সালগাম: ইহাদের ব্যাবসা দারুচিনি ও এলাচির। ইহারা প্রধানত থাকে সমুদ্র-তীরবর্তী বালাপিটিয়া, কোসগড় এবং বাসকাডুয়া অঞ্চলে।

দুবার: ইহাদের ব্যাবসা নারিকেল গাছে আরোহণ করিয়া নারিকেল সংগ্রহ করা, ইহারা নারিকেলের তাড়িও করিয়া থাকে। যেখানে নারিকেলের চাষ আছে, সেখানেই ইহাদের দেখা যাইবে।

বড়হেল: কুম্ভকার; টেঙ্গল জেলাতে প্রধানত ইহাদের বাস।

নবন্দান: স্বর্ণকার এবং কামার।

রদা: ধোপা।

বেরবা: ঢুলি (বের = ঢোল), বৌদ্ধমন্দিরে, কোনো সিংহলী পর্ব মিছিল উপলক্ষ্যে টমটম বা ঢোল বাজাইয়া থাকে—ইংরেজিতে ইহাদের বলে টম্ টম্ বিটার। ইহারা মন্ত্রতন্ত্র তুক্‌তাক্ ওঝার কাজও করিয়া থাকে।

হুন্নো: যারা চুনের ব্যাবসা করে (হুনু = চুন)।

রোডিয়া: অস্পৃশ্য জাতি (রোড্ড = নোংরা), এরা দাক্ষিণাত্যের পঞ্চমের শামিল। এরা রত্নপুরের পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসী। ইহাদের ছোঁয়া কেউ খায় না, এরা কোনো বাড়ীর হুদ্দায় প্রবেশ করিতে পারে না। শহরে ভিক্ষা ছাড়া আর উপার্জন নাই। কারো বাড়ীতে ভিক্ষা করিতে আসিলে, গেটের বাহিরে দাঁড়াইয়া থাকিতে হয়। পুরুষ কি মেয়ে কারো গাত্রাবরণ নাই; মেয়েরা শহরে আসিলে এক টুকরা কাপড়ে বুক ঢাকিয়া রাখে, গ্রামে শরীরের উপরিভাগ খোলা থাকে।

বিবাহ

বিভিন্ন জাতির ভিতর বিবাহ হইতে পারে না। যদিবা কোনো সময় বিভিন্ন জাতির ভিতর বিবাহ হইয়া যায়, তবে জানিতে হইবে, সেটা পিতামাতার বিনানুমতিতেই হইয়াছে। "লভ ম্যারেজ" পিতামাতা পছন্দ করেন না, আর সিংহলে ভীষণ রকম পণপ্রথা থাকায় লভ ম্যারেজ হইতে পারে না, কারণ, তাহাতে পণ না পাওয়ারই সম্ভাবনা। আমাদের দেশের মতই কাপুরাল (ঘটক) বিবাহের প্রস্তাব আনে এবং দেনাপাওনা ঠিক করে; বিবাহের প্রস্তাব উঠিলেই সবচেয়ে দরকারী বিষয় হইল পণ। কাপুরালের সাহায্যে বরকনের দুই দলের ভিতর অর্থের পরিমাণের কথা ঠিক হইলে অন্য কথা। পণের পরিমাণ ভীষণ, একজন অ্যাডভোকেট হইলে পঞ্চাশ হাজার টাকা দাবি করিতে পারে। বরের আর্থিক অবস্থা, সামাজিক স্থান, শিক্ষা অনুসারে পণের পরিমাণ নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। পণ ঠিক হইলে কোষ্ঠী দেখা হইবে।

সিংহলীদের কোষ্ঠীর উপর খুব বিশ্বাস। কোষ্ঠীতে যদি বরকনের মিল না পাওয়া যায়, তবে হয়তো সম্বন্ধ ভাঙিয়া যাইতে পারে। বিবাহের সময় পঞ্চাঙ্গলিথ বা পঞ্জিকা দেখিয়া দিন ঘণ্টা মিনিট ঠিক হইবে। সিংহলীদের পঞ্জিকা দেখার চল আছে। কোথাও বাহিরে গেলে দিনক্ষণ দেখিয়া বাহির হয়। বিবাহের সকল ব্যবস্থা ঠিক হইয়া গেলে বরকনের ভিতর একটু-আধটু দেখা-সাক্ষাৎ চলিতে পারে, ঐ যা একটু পূর্বরাগ। কনের বাড়িতে গিয়া বর আত্মীয়স্বজনের সম্মুখে যখন আংটি বদল করিয়া আসে তখন পাকাপাকি হইয়া যায়। আংটি বদলের পনেরো দিন পর হইতে তিন মাসের মধ্যে বিবাহ হয়। বিবাহের দুই অনুষ্ঠান, বিলাতি মাফিক রেজিস্টারি করার প্রয়োজন হয়, এবং দেশীয় কতগুলি অনুষ্ঠান আছে। সিংহলে বিধবাবিবাহের চলন আছে।
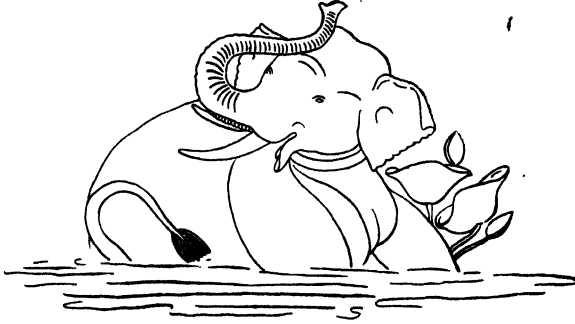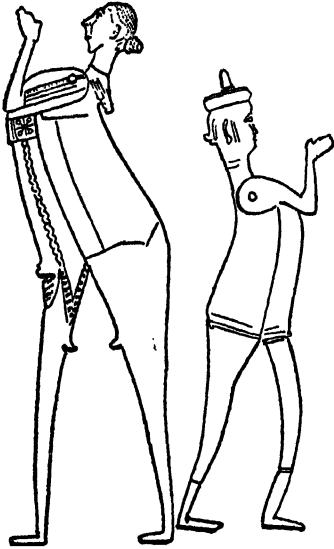
সিংহলী ভাষায় উৎসবকে বলে মাঙগল্য। বছরে চারটি মাঙগল্য অনুষ্ঠিত হয়। ইহাতে হিন্দুপ্রভাব লক্ষিত হইবে। ১ আভুরুদ (নববর্ষ—বৈশাখ), ২ পেরহেরা (আষাঢ়), ৩ কার্তি (হিন্দু দীপাবলী—কার্তিক), ৪ আলুটসন (খন্দ পার্বণ, নব-ধান্য উৎসব—পৌষ)।

সিংহলীদের শ্রেষ্ঠ উৎসব হইল পেরহেরা। বহু সহস্র নরনারী কাণ্ডিতে এই উৎসব দেখিতে আসে; প্রাচীনকাল হইতে আধুনিক কাল পর্যন্ত পূর্ণোদ্যমে এই উৎসব চলিতেছে। প্রথমত চার হিন্দুদেবতার উদ্দেশে এই উৎসব আরম্ভ হইয়াছিল : নাথ, বিষ্ণু, কাতরগাম, পট্টিনিবেদী। উপযুক্ত সময় দেখিয়া পূর্ণিমা তিথিতে একটি কাঁঠালগাছ চার ভাগে কাটিয়া বাদ্যভাণ্ড সহকারে মন্দির-প্রাঙগণে রোপণ করা হয়। ফুল লতাপাতা দিয়া এইসব বৃক্ষদণ্ড সাজানো হয়। এই দণ্ডের নাম 'এহালা গাহা' (আষাঢ় গাছ)। উক্ত চারিটি দেব-মন্দির হইতে বিরাট শোভাযাত্রা বাহির হয়। আগে আগে চলে হাতীর পিঠে করিয়া দন্ত চিহ্ন। দালদা মালিগাওয়া হইতে দন্ত চিহ্ন বাহির হয়। সঙ্গে-সঙ্গে চলে অলংকৃত বহু হাতী, নৃত্য, গীত, পতাকা। কাণ্ডির কলাবিদ্যার নিদর্শন এই শোভাযাত্রায় পাওয়া যায়। রাত্রিকালে মশালালোকে শোভাযাত্রায় যখন বাদ্যভাণ্ড সহকারে কাণ্ডিয়ান নৃত্য দেখা যায় মন তখন এক ক্লাসিকাল যুগে চলিয়া যায়। ইহার সঙ্গে তুলনা করিলে ঢাকার জন্মাষ্টমীর মিছিলও নিষ্প্রভ মনে হইবে। সিংহলের প্রাচীন শিল্পকলা এবং ঐশ্বর্যের দ্যুতি চিরতরে নিবিয়া গিয়াছে, তাহারই একটা আলোকরেখা এই পেরহেরার মধ্যে রহিয়া গিয়াছে। কাণ্ডিয়ান নৃত্য দেখিয়া মনে হয় যুদ্ধনৃত্য (ওয়র ডান্স)। প্রাচীন রাজারা যখন যুদ্ধ জয় করিয়া সগৌরবে স্বদেশে ফিরিতেন, তখন হয়তো, এরূপ শোভাযাত্রা বাহির হইত। অজন্তার ১৬নং গুহার বিজয়ের সিংহল-জয়ের চিত্রের কথা পেরহেরা স্মরণ করাইবে। বস্তুত এই উৎসব যুদ্ধজয়ের স্মৃতিরক্ষার্থে উদ্ভূত হইয়াছিল। খৃস্টপূর্ব ২৩৭ অব্দ হইতে সিংহলে তামিল আক্রমণ শুরু হয়, বহুবার তামিলরা সিংহলের সিংহাসনে

বসিয়াছে। ইহার প্রতিশোধ নেন সিংহলের সম্রাট গজবাহু। ইনি ১১৩ খৃস্টাব্দে দক্ষিণ-ভারত প্রথম আক্রমণ করেন, এবং বারো শত তামিল বন্দী লইয়া আসেন। এই যুদ্ধজয়ের স্মরণার্থ পেরহেরা-উৎসব। গজবাহুর সময় হইতে আজ পর্যন্ত এই উৎসব চলিয়া আসিতেছে। প্রাচীনকালে দন্ত চিহ্ন এই উৎসবে বাহির হইত না, কীর্তিশ্রীর সময় হইতে দন্ত চিহ্ন শোভাযাত্রার পুরোভাগে চলিতে থাকে।

পেরহেরা পূর্বে ছিল হিন্দু উৎসব, শ্যামদেশীয় ভিক্ষুদের সন্তোষার্থে রাজা কীর্তিশ্রী ইহাকে বৌদ্ধ উৎসবে পরিণত করেন। রাজারা নিজে এবং কান্ডির সামন্তেরা (chief) এই শোভাযাত্রার সঙ্গে চলিতেন, জাঁকজমকপূর্ণ অলংকার ও পোশাকে সজ্জিত হইয়া। রাজা চলিতেন সোনার রথে, আট ঘোড়া তাঁহাকে টানিত।

সিংহলের উৎসবের একটা অঙ্গ গৃহসজ্জা এবং তোরণ। সিংহলীরা এ কাজে নিপুণ। রাস্তায় কাপড়ের তোরণ নির্মিত হয়। এ কাজের কারিগর হইল ধোপা। একটা দড়িতে নারিকেলের পাতা ঝুলাইয়া রাস্তা সাজানো হয়। উৎসবের কালে সমস্ত শহরের সাজসজ্জা আনন্দের বার্তা প্রচার করে।

নেত্রমাঙ্গল্য : কোনো বিহারে বুদ্ধমূর্তি নির্মাণ শেষ হইলে, খুব ধুমধাম করিয়া বাদ্যভান্ড সহকারে নেত্রমাঙ্গল্য (চক্ষুদান) অনুষ্ঠান শেষ হয়। এই অনুষ্ঠানের পুরোহিত স্বয়ং কারিগর। কারিগর অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণের মর্যাদা প্রাপ্ত হয়। বৌদ্ধ সংস্কৃতির মধ্যে অনেক ব্রাহ্মণ্য অনুষ্ঠান ঢুকিয়া গিয়াছে তাহার ভিতর নেত্রমাঙ্গল্য একটি। মন্দির-প্রাঙ্গণে অষ্টদিকপালের বেদি নির্মিত হয়; অষ্টদিকপাল ইন্দ্র অগ্নি যম নৈঋত বরুণ বৈজব্য উত্তর ও ঈশান।

এই অনুষ্ঠানে একটি সংস্কৃত অষ্টক আবৃত্তি করার বিধি আছে—

গঙ্গাযমুনা তীরে, গোধা সিন্ধু সরস্বতী
নর্মদাসিন্ধু কাভেরি, জলেসনসমিন সন্তি মিসপুরে
পদ্মন পত্রন বিসা লক্ষি পদ্মন কেসরন ভবন
নিত্যন পদ্মালয়ন দেবী সবাঃ পাতু সরস্বতী।

সংস্কৃত ভাষায় অনভিজ্ঞ কারিগরের হাতে পড়িয়া সংস্কৃত বিকৃত হইয়া গিয়াছে। এই শ্লোকের প্রথম দুই লাইন স্মরণ করাইবে—

ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি।
নর্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু॥

বাঙ্গালীরা স্নানের সময় এই শ্লোক উচ্চারণ করিয়া থাকে।

দর্পণ : সিংহলীদের কোনো কোনো অনুষ্ঠানে দর্পণে বুদ্ধমূর্তি দেখার রীতি আছে। বাঙলায় দর্পণে দুর্গামূর্তি দেখার রীতি স্মরণ করাইবে।

কঠিন বস্ত্র : ভিক্ষুদের বস্ত্রদান করা পুণ্যকর্ম। যদি একদিনের মধ্যেই গাছ হইতে তুলা পাড়িয়া, সুতা বানাইয়া তাঁতে বুনিয়া বস্ত্র নির্মাণ করা যায়, তাহা দান করিলে আরো বেশি পুণ্য হয়। একদিনে তৈরি এরূপ বস্ত্রকে বলা হয় কঠিন বস্ত্র। রাজারা এরূপ বস্ত্র নির্মাণে খুব যত্ন নিতেন। দ্বিতীয় পরাক্রমবাহু এরূপ ৮০টি কঠিন বস্ত্র দান

করিয়াছিলেন। বুদ্ধের ৮০ জন প্রধান শিষ্য ছিল, তাহাদের স্মৃতির জন্যই ৮০টি বস্ত্র দান করা হইয়াছিল। হাজার হাজার নরনারীকে রাজা এ কাজে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। একদিনের মধ্যেই গাছ হইতে তুলা পাড়িয়া, বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া, কাটিয়া সেলাই করিয়া রঙ করিয়া দান করা হইয়াছিল।

গৃহস্থেরাও ঐরূপ দানকর্ম করিত। তাঁতীরা কাপড় বুনিত, সেটা উচ্চজাতির কর্ম নহে, কিন্তু গৃহের মহিলারা চরকায় সূতা কাটিত।

বৌদ্ধ মন্দিরে ব্রাহ্মণ্য দেবতা : বৌদ্ধবিহারের সঙ্গে হিন্দু দেবালয় দেখা যায়। সিংহলীরা বলে দেবল। অনেক সময় হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি বুদ্ধের সঙ্গে একই ছাদের নীচে দেখা যায়। পাঁচটি দেবতা স্থান পাইয়াছে—(১) বিষ্ণু, (২) নাট দেবিয়ো (মৈত্রী বুদ্ধ), (৩) কাতরগাম দেবিয়ো (কার্তিকেয়), (৪) পট্টিনি ও (৫) সমন (লক্ষ্মণ)। তামিল রাজত্বের সময় রাজারা বিহারের সঙ্গে হিন্দু দেবালয় নির্মাণ করিয়াছে। এই হিন্দু দেবতারা বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে, এবং সিংহলীরা মানিয়া লইয়াছে।

বিজয় সিংহ ছিলেন বিষ্ণুর উপাসক। সিংহলীরা বিষ্ণুকে দ্বীপের রক্ষাকর্তা বলিয়া মানে। সিংহলী নাট্যকার ডায়াস বিজয় সিংহের কাহিনী সিংহলী ভাষায় লিখিয়াছেন; একদিন দেখিতে গিয়াছিলাম। স্টেজের উপর বিষ্ণুর আগমন আছে।

তামিল নৃপতি এলার-এর ইষ্টদেবতা ছিলেন কাতরগাম। দক্ষিণসিংহলের অরণ্যের মধ্যে কাতরগামের মন্দির আছে, ইহা একটি বড় তীর্থস্থান। সমগ্র সিংহল হইতে, এমন-কি ভারতবর্ষ হইতেও বহু সহস্র তীর্থযাত্রী এখানে আসিয়া থাকে।

পাঁচটি প্রধান ছাড়া আরো দু জন হিন্দু দেবদেবী সিংহলে প্রবেশাধিকার পাইয়াছে—গণদেবিয়ো (গণেশ), ভূমিদেবী (ধরিত্রীমাতা)। মারের আক্রমণের ভয়ে সকল দেবতা বুদ্ধকে ত্যাগ করেন, কিন্তু ভূমিদেবী করেন না।

ইহা লক্ষ্য করার বিষয়, সিংহলে কোথাও শ্রীরামচন্দ্রের স্থান নাই, কিন্তু লক্ষ্মণ পূজা পাইতেছেন।

সিংহলে বাঙ্গালী ভিক্ষু ও ভক্তিবাদ : "রামচন্দ্র বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ। ইনি ত্রয়োদশ শতাব্দীর মাঝের দিকে সিংহলে গিয়েছিলেন। সেখানে ত্রিপিটকাচার্য রাহুলপাদের কাছে পালি ত্রিপিটক অধ্যয়ন করে হীনযান-মত অবলম্বন করেন। সিংহলরাজ পরাক্রমবাহু এঁকে বৌদ্ধগমচক্রবর্তী উপাধি দিয়েছিলেন। সেখান থেকে রামচন্দ্র কেদার ভট্ট লিখিত বৃত্ত-রত্নাকরের টীকা এবং ভক্তিশতক ও বৃত্তমালা নামক দুটি গ্রন্থ রচনা করেন। ভক্তিশতকে বৈষ্ণব ভক্তিবাদের পরিচয় পাওয়া যায়।"[২]

শ্রীপাদশৈল : অ্যাডম্‌স্‌ পিক্‌কে সিংহলীরা শ্রীপাদশৈল বলে; নরম মাটির উপর যেরকম পায়ের ছাপ পড়ে, সেরকম, গোড়ালি হইতে আঙুলের ডগা পর্যন্ত চার পাঁচ ফুট লম্বা পায়ের ছাপ পাহাড়ের উপর আছে, সেজন্য শ্রীপাদশৈল বলা হয়। ইহার আর এক নাম সমনল, কারণ এই পর্বতের রক্ষাকর্তা দেবতা সমন।

দূরে দিকচক্রবালে ভারত মহাসাগর দেখা যায়, সূর্যালোকে চক্‌চক্‌ করিতেছে।

---

২ প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী। ডক্টর সুকুমার সেন। বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ

"The panorama from the summit of Adam's Peak is perhaps the grandest in the World".৩

ইবন বাটুটা : এখন যেমন মুসলমান তীর্থযাত্রীরা অ্যাডামস্ পিকে তীর্থ করিতে যায়, প্রাচীনকালেও তেমনি যাইত। এমনকি বাহির হইতেও তীর্থযাত্রী আসিয়াছে। প্রসিদ্ধ মুর পরিব্রাজক ইবন বাটুটা চতুর্দশ শতাব্দীতে সিংহলে আসিয়াছিলেন। ১৩২৪ খৃস্টাব্দে তিনি টানজিয়র হইতে তীর্থভ্রমণে বাহির হন। সিংহলের অনেক স্থানে ভ্রমণ করেন। এবং অ্যাডামস্ পিকে গিয়া আদি পিতার পায়ের ছাপ দেখিয়াছিলেন। পাহাড়ের পথে ভীষণ জোঁক দেখিয়াছিলেন, মানুষের মত দাড়িওয়ালা বানর দেখিয়াছেন। গাছ দেখিয়াছেন যার পাতা পড়ে না; লাল গোলাপের গাছ (রডোডেনড্রন) দেখিয়াছেন। পাথরের কাটা সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিতে হইয়াছে, সিঁড়িতে লোহার শিক পোতা ছিল, এবং তাহাতে লোহার শিকল লাগানো ছিল। এসব এখনো আছে। আলেকজেন্দারের নামের সঙ্গে এসকল শিকল যুক্ত রহিয়াছে। দুটি রাস্তা পায়ের ছাপের নিকট গিয়াছে, একটি বাবার রাস্তা, একটি মায়ের রাস্তা, অর্থাৎ আদম ও ইভের নামে রাস্তা।

ফাহিয়ান ও হিউএনচাঙও শ্রীপাদশৈল দর্শন করিয়াছিলেন।

অপদেবতাদের পূজা : সিংহলীদের অপদেবতার উপর বিশ্বাস আছে, তাহাদের বলা হয় যক (যক্ষ)। যকের প্রভাবে মানুষের অমঙ্গল ও অসুখ হয়। ইহাদের প্রভাব দূর করার জন্য অনুষ্ঠান আছে। নৃত্য দ্বারা ইহাদের প্রভাব দূর করা হয়। গায়ে নানা রং মাখিয়া ভূত সাজিয়া নৃত্য করে; এই নৃত্যকে বলা হয় devil dance—ভূতনৃত্য। এসকল ভূতের ওঝারা সাধারণত নীচু জাতের লোক। প্রাক্ বৌদ্ধ যুগের অনুষ্ঠান লৌকিক ধর্মে প্রবেশ করিয়াছে।

বুদ্ধের দার্শনিক তত্ত্ব জাতীয় কুসংস্কারকে দূর করিতে পারে নাই। এমনকি খৃস্টানরাও কুসংস্কার হইতে মুক্ত নহে; তাহারা বুদ্ধকে ত্যাগ করিয়াছে, কিন্তু ভূতপ্রেতকে ত্যাগ করিতে পারে নাই। বৌদ্ধদের ন্যায় খৃস্টানরাও ভূতপ্রেতের পূজা করিয়া থাকে।

দুই হাজার বৎসর ধরিয়া বৌদ্ধ ধর্মের রীতিনীতি অপরিবর্তিত। এজন্য টেনেন্ট বলিয়াছেন, সিংহলীরা 'Living mummies of the past'।

বলি-উৎসব : সিংহলীদের জ্যোতিষের উপর প্রবল বিশ্বাস থাকাতে নক্ষত্রমণ্ডলীকে পূজা করে। 'বলি উৎসব' দ্বারা নক্ষত্রমণ্ডলীর পূজা হয়। এই উপলক্ষ্যে দেবতাদের মাটির অস্থায়ী মূর্তি নির্মাণ করা হয়; অধিকাংশ মূর্তিই ভীষণাকার। নীচু জাতের লোক 'বেরবা' (ঢুলী) এই উৎসব সম্পন্ন করে। বেরবারা জ্যোতিষের কর্মও করিয়া থাকে।

শিক্ষা : গ্রাম্য পানশালাতে (ভিক্ষুদের বাসগৃহ) বালকদের শিক্ষা আরম্ভ। পিতা পুত্রের ছয় বৎসর বয়সের সময়, কিঞ্চিৎ উপহার লইয়া ভিক্ষুর কাছে লইয়া যাইত। ভালো দিনক্ষণ দেখিয়া অক্ষরপরিচয় শুরু হইত। উচ্চশিক্ষার জন্য খুব কম লোকই যাইত। যাহারা ফলিতজ্যোতিষ, চিকিৎসা, ধর্মযাজকের বৃত্তি (ভিক্ষু) গ্রহণ করিত, তাহারা উচ্চশিক্ষার জন্য

৩ Tennent.

যাইত। ভিক্ষুর ব্রত গ্রহণেচ্ছুদের পালিভাষা ভালো করিয়া অধ্যয়ন করিতে হইত। চিকিৎসা-বিদ্যায় প্রথম পড়িতে হইত আরিষ্ট শতক।

আধুনিক কাল হইতে প্রাচীনকালে লিখনপঠনক্ষম লোকের সংখ্যা অনেক বেশি ছিল। ভারতবর্ষেও ব্রিটিশ-শাসনের পূর্বে লিখনপঠনক্ষম লোকের সংখ্যা বেশি ছিল। তৃতীয় বিজয়বাহু (১২৩৬ খৃস্টাব্দ) প্রত্যেক গ্রামে বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন এবং ভিক্ষুদের শিক্ষাদানের ভার দিয়াছিলেন। তিনি নির্দেশ দিয়াছিলেন যে ছাত্রদের নিকট হইতে কিছু গ্রহণ করিতে পারিবে না এবং তিনি স্বয়ং তাঁহাদের পরিশ্রমের জন্য পুরস্কার দিবেন।

বিশ্ববিদ্যালয় : ষষ্ঠ পরাক্রমবাহু (১৪১০—১৪৬২ খৃস্টাব্দ) যখন কোট্টেতে রাজত্ব করিতেন, তোতাগামুয়া এবং কেরাগালাতে দুটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন, রাজা নিজে একজন পণ্ডিত এবং গ্রন্থকার ছিলেন। তোতাগামুয়ার অধ্যক্ষ ছিলেন শ্রীরাহুল স্থবির। তিনি সিংহলের শ্রেষ্ঠ কবি। বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম ছিল বিজয়বাহু পরিবেন। হিন্দু বৌদ্ধ সকলেই ইহাতে শিক্ষা পাইত। এই কয় বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হইত— ১ সকল বিভাগের বৌদ্ধশাস্ত্র, শুধু ভিক্ষুদের জন্য, ২ সিংহলী, পালি, সংস্কৃত এবং তামিল ভাষা, ৩ ব্রাহ্মণ ছাত্রদের জন্য চতুর্বেদ এবং সংশিলষ্ট অন্যান্য সাহিত্য, ৪ জ্যোতিষ, ৫ আয়ুর্বেদ, ৬ ছন্দবিদ্যা, ৭ নাটক রচনার বিবিধ পদ্ধতি, ৮ কাব্য—সংস্কৃত, পালি, সিংহলী, তামিল।

হাসপাতাল : সিংহলে প্রাচীনকালে আয়ুর্বেদচর্চা ছিল; আজিকার দিনেও সিংহলে আয়ুর্বেদের আদর আছে। গ্রাম্য অঞ্চলের লোকেরা ডাক্তার হইতে কবিরাজকে অধিক বিশ্বাস করে। সিংহলী ভাষায় কবিরাজকে বলে বেদাচারিয়।

নৃপতি বুদ্ধদাস (৩৩৯ খৃস্টাব্দ) একজন বড় চিকিৎসক ছিলেন; তিনি চিকিৎসা-বিজ্ঞান 'সারাত্থসংগ্রহ' রচনা করেন। এমনকি বর্তমান কালেও চিকিৎসকগণ এই পুস্তক অধ্যয়ন করিয়া থাকেন। রাজা বুদ্ধদাস আদেশ করেন, প্রত্যেক ডবল পাঁচ গ্রামের জন্য একজন করিয়া চিকিৎসক থাকিবে। এসকল চিকিৎসকের ভরণপোষণের জন্য ক্ষেত্রের উৎপাদনের ২০ ভাগের এক ভাগ রাখিয়া দিয়াছিলেন। দুটগামিনি মৃত্যুশয্যায় বলিয়াছিলেন, 'আঠারটি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রতিদিন হাসপাতাল চালাইয়াছি, রোগীদের জন্য আহার, চিকিৎসকদের দ্বারা প্রস্তুত করাইয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিয়াছি।' আট শত বৎসর পর পরাক্রমবাহু সেই রীতি অনুসরণ করিয়াছিলেন।

অশোকের নীতি অনুসরণ করিয়া সিংহলের বহু নৃপতি হাসপাতাল স্থাপন করিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, পশুপক্ষীর জন্যও চিকিৎসার ব্যবস্থা ছিল। গিরনারের শিলালেখ হইতে জানা যায়, অশোক সমগ্র সাম্রাজ্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, এমনকি তাম্বপর্ণি (সিংহল) পর্যন্ত, যেখানে বৌদ্ধধর্মে বিশ্বাসী লোকেরা বাস করে, মানুষ এবং পশুর জন্য চিকিৎসা ও ঔষধের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

কৃষিকার্য : সিংহল কৃষিপ্রধান দেশ। প্রাচীন সিংহলে কৃষকদের খুব সম্মান ছিল। তাহাদের ভাষা ও রুচি মার্জিত। সিংহলের একটি প্রবাদবাক্য 'একটি কৃষকের ধুলা ঝাড়িয়া, লাঙল হইতে সরাইয়া লও, সে একটি রাজত্ব শাসন করার উপযুক্ত।'

ধনী নির্ধন সকলেই লাঙল ধরিত, এমনকি অনেক রাজাও স্বয়ং লাঙল ধরিয়া চাষ করিয়াছেন। স্বহস্তে চাষ করিয়া, শস্য উৎপাদন করিয়া, তাহা ভিক্ষুদের দান করিলে,

অধিক পুণ্য হয়, এই বিশ্বাসে অনেক রাজা নিজে চাষ করিয়াছেন। ধনীরা হাতীর দাঁতের বাঁটওয়ালা ও কারুকার্য খচিত কাস্তে লইয়া ক্ষেতে কাজ করিয়াছে। জমিহীন লোক সিংহলে খুব কমই দেখা গিয়াছে। সিংহলীদের প্রধান শস্য ধান এবং ইহাই তাহাদের প্রধান উপজীবিকা ছিল। রাজা হইতে আরম্ভ করিয়া সকল লোকেরই জমির সঙ্গে সম্বন্ধ ছিল। রাজা কর হিসাবে অর্থ ও শস্য দুইই গ্রহণ করিতেন। রাজার নিজেরও ব্যক্তিগত চাষের জমি ছিল। ভিক্ষুদের মঠের নিজস্ব জমি ছিল। প্রাচীন রাজাদের নিকট হইতে ভরণপোষণের জন্য বৌদ্ধ মঠ যে জমি দানস্বরূপ পাইয়াছে, তাহা আজ পর্যন্তও ভোগ করিতেছে।

১৯০১ সনের আদমসুমারীতে দেখা যায়, মধ্যপ্রদেশে এক হাজার লোকের মধ্যে ৯০৬ জন কৃষিকার্য করে, ৩২ জন (শতকরা ৩·২ জন) কারিগর, ১৮ জন চাকুরী করে, ৯ জন ব্যবসা করে, ১০ জন অন্যান্য।

বিজয়ের আগমনের পূর্বে সিংহলের আদিম জাতিরা কৃষিকার্য জানিত না; শিকার করিয়া খাইত। এখনও বেদ্দারা ফল, মধু ও শিকারে জীবন ধারণ করে। বিজয়ের আগমনের পরে কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত রাজারা হরিণ ও শূকর শিকার করিত। বিজয়ের দুই শত বৎসর পরেও চাষ এত কম ছিল যে, অশোক সিংহলে যে উপহার পাঠাইয়াছিলেন, তাহার ভিতর ছিল ১৬০ বস্তা বঙ্গদেশের পাহাড়ী ধান্য। এ সময়ে দক্ষিণভারতের কোরোমণ্ডল তীর হইতে ধান চালান যাইত।

সেচ-ব্যবস্থা : কৃষিক্ষেত্রে জল সেচনের জন্য সিংহলের রাজারা বিরাটাকার দীঘি ও পয়ঃপ্রণালী খনন করাইয়াছেন। এই বিষয়ে তাঁহারা ইঞ্জিনিয়ারিং-বিদ্যার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। পশ্চিমের পর্যটকরা ইহা দেখিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছে; পয়ঃপ্রণালী-নির্মাণে সিংহলীরা প্রাচীন মিশর হইতে ন্যূন ছিল না, এরূপ উক্তি করিয়াছে। হাতে কাটা এসব দীঘি হ্রদের মত। সর্বাপেক্ষা বড় জলাশয় হইল 'কলা বেওয়া' (বাপী)। ইহার বেড় চল্লিশ মাইল। ইহার অনেক অংশ বুজিয়া গিয়া ভিতরে গ্রাম হইয়া গিয়াছে। ইহার তীরে সুউচ্চ ১২ মাইল লম্বা বাঁধ আছে। পয়ঃপ্রণালী নির্মাণে সিংহলের এত খ্যাতি হইয়াছিল যে, অষ্টম শতাব্দীতে কাশ্মীর হইতে হ্রদ নির্মাণের জন্য সিংহলী ইঞ্জিনিয়ার চাহিয়া পাঠানো হইয়াছিল। সিংহলের রাজারা পয়ঃপ্রণালীর খনন ও সংস্কার সাধন করিয়া কৃষিকর্ম অব্যাহত রাখিয়াছে। ক্রমাগত তামিল ও মালাবারদের আক্রমণে সিংহলীদের জীবনধারা ব্যাহত হইয়াছে; যুদ্ধবিগ্রহের জন্য এসকল দীর্ঘিকা ও পয়ঃপ্রণালী পরিত্যক্ত হইয়াছে। কৃষিক্ষেত্র ও লোকবহুল জনপদ জঙ্গলে পূর্ণ হইয়াছে। সিংহল অন্নের জন্য অন্যদেশের উপর নির্ভর করিত না, আজ বঙ্গদেশের চালের উপর নির্ভর করিতে হইয়াছে।

গ্রামের স্বায়ত্তশাসন : সিংহলের জীবনধারা রক্ষা করার আর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল গ্রামের স্বায়ত্তশাসন। গ্রাম-সবা (গ্রাম-সভা) গ্রামের সবকিছুর বিধিব্যবস্থা করিত; সেজন্য প্রতি গ্রামে থাকিত একজন করিয়া মোড়ল। তাহাদের অধীনে থাকিত কারিগর, নাপিত, জ্যোতিষ, ধোপা। গ্রামের সকল ব্যাপার নিজেদের দ্বারাই নিষ্পত্তি করিত। গ্রামের লোকেরা নিজেরাই দীর্ঘিকা খাল রক্ষা করিত ও সংস্কৃত করিত।

এখনো অনুরাধাপুর শহরে প্রাচীন পয়ঃপ্রণালীর নিদর্শন দেখা যায়। সিংহল ভ্রমণের সময়, অনুরাধাপুরের ইসুরুমুনিয়া বিহারে বাস করিতেছিলাম। বিহারের সামনে রাস্তার

পাশে পয়ঃপ্রণালী অনুরাধাপুরের জলাশয় তিস্‌স বেওয়ার সঙ্গে যুক্ত। ভোরে, সন্ধ্যায় দেখিলাম, স্নানাদির জন্য জল ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে; অন্য সময় এগুলি থাকে শুক্‌না, আধুনিক শহরে জলের কলের যে রকম ব্যবস্থা। দুই হাজার বৎসর পূর্বেও বোধ হয় অনুরাধাপুরের এ রকম ব্যবস্থা ছিল।

রাজারা এসকল কার্য অনেক সময় forced labour দ্বারা করাইয়াছেন, ইহাকে সিংহলী ভাষায় বলে রাজকারিয় (রাজকার্য)। রাজারা যুদ্ধের তামিলকয়েদীদের দ্বারাও করাইতেন।

ক্রীতদাস প্রথার চলন ছিল। শিলালেখ হইতে জানা যায়, বিহারের কার্যের জন্য ক্রীতদাস দান করা হইয়াছে। ইহারা বিহারের কৃষিক্ষেত্রে কর্ম করিয়াছে।

প্রাচীনকালে যেমন এখনো তেমনি মহিষের সাহায্যে চাষ হয়। বলদের ব্যবহার ছিল না; মহাবংশে ঘি-মাখনের উল্লেখ আছে, কিন্তু তাহা মহিষের।

পল্লীবাসীদের তরকারী ও ফলের উদ্যান ছিল, সুপারির সারি, কমলালেবু, লেবু, কাঁঠাল গাছ, ব্রেডফ্রুট (তরকারী হিসাবে ইহার ফল ব্যবহার হয়, ভারতে এই গাছ নাই), কলার বাগান, পেয়ারা এবং পেঁপে প্রচুর; বেগুন এবং অন্যান্য শাকসব্জী। মাঝে মাঝে তাল ও নারিকেলের কুঞ্জ। নীচে কোথাও কফি ও দারুচিনির ঝোপ। সুপারি গাছ বাহিয়া উঠিয়াছে পান ও গোলমরিচের লতা। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে, সিংহলীরা বাঙালীদের মত, প্রাচীনকালে যেমন, আধুনিক কালেও তেমনি পান খাইতে ভালবাসে। গ্রামাঞ্চলে কোঁচড়ে সর্বদা পানসুপারি থাকে। অনেক সময় সুদৃশ্য চুনের কৌটা দেখা যায়, ধনীদের রূপার কৌটা, অন্যদের তামার।

খাদ্য : রাজা-প্রজা সকলেরই এক খাদ্য—ভাত। ভাতের সঙ্গে চিনি মধু অথবা ঘি মাখিবার উল্লেখ দেখা যায়। মাস (ডাল)-এর উল্লেখ আছে। বৌদ্ধদের জৈন অথবা বৈষ্ণবদের মত মাছ-মাংস খাওয়া নিষিদ্ধ নহে; তবে সময় সময় কোনো রাজা মাছ-মাংস খাওয়া নিষেধ করিয়াছিলেন। প্রাচীনকালে কি ছিল বলিতে পারি না, আধুনিককালে ভারতের বৈদিক যুগের মত সিংহলে গোমাংসের চল আছে। অধুনা সিংহলীরা নোন্‌তা ও শুট্‌কী মাছ খাইয়া থাকে, সমুদ্রের তীরবর্তী স্থানে প্রচুর সমুদ্রের টাট্‌কা মাছ পাওয়া যায়; নদীতে মাছ বিশেষ পাওয়া যায় না। তরীতরকারী প্রচুর আছে। অম্বলকড়ুয়া নামে একপ্রকার শুটকী মাছের ব্যবহার আছে, যাহা ভারতবর্ষে কোথাও নাই, শুনিয়াছি, এরূপ দ্রব্যের ব্যবহার জাপানে আছে। ইংরেজিতে ইহাকে 'মালডিউ ফিস' বলে, কেননা ইহা সিংহলের নিকটবর্তী মালদ্বীপ হইতে আসে। মাছ শুখাইলে এক টুকরা চন্দন কাঠের মত হয়, তাহা ছুরি দিয়া চাছিয়া মসলার মত সকল ব্যঞ্জনে ডাল তরকারী প্রভৃতি সকল দ্রব্যে দেয়। তেলের ব্যবহার নাই; টাটকা নারিকেল কোড়ার রস রান্নায় ব্যবহার করে।

জাতীয় বৈশিষ্ট্য : একটা জাতির বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায়, তার ভাষা এবং পোশাক-পরিচ্ছদ হইতে। গুজরাটে যখন প্রথম প্রাচীন পারসীক আশ্রয়প্রার্থীরা আসিল, তখন রাজা বলিয়াছিলেন, পারসীকদের রাজ্যে আশ্রয় দিবেন, যদি পারসীকরা তাঁর শর্ত মানিয়া লয়। পারসীকদের গুজরাটী ভাষা ও গুজরাটী পরিচ্ছদ গ্রহণ করিতে বাধ্য করিয়া তিনি তাহাদের রাজ্যে স্থান দিলেন। বিদেশী পারসীকেরা একেবারে গুজরাটী বনিয়া গেল। সিংহলীদের সেই রকম ভাষা ও পরিচ্ছদ হইতে জাতীয়ত্বের পরিচয় পাওয়া যাইবে না।

তারা নামমাত্র সিংহলী জাতি। এতবড় একটা ঐতিহ্যের অধিকারী কি করিয়া নিজেদের সব হারাইয়া ফেলিয়াছে, ভাবিতে দুঃখ হয়।

সিংহলীরা নানাজাতির সংস্পর্শে আসিয়া নিজের জাতীয়তার চিহ্ন ঘুচাইয়া ফেলিয়াছে। আধুনিক সিংহলীরা নানা বিচিত্র পোশাকে সজ্জিত, ইহা হইতে তাহাদের স্বকীয় প্রাচীন ধারার পোশাক খুঁজিয়া বাহির করা দুরূহ। আধুনিক কালে অধিকাংশই লুঙ্গি পরিয়া থাকে, সিংহলী ভাষায় লুঙ্গিকে বলে সারং। আমার মনে হয়, সারং মালয় উপদ্বীপ হইতে আসিয়াছে। মালয়েও লুঙ্গিকে সারং বলে। আর-একটা অদ্ভুত জিনিস আসিয়াছে; পুরুষেরা কচ্ছপের খোলার চিরুণী মাথায় পরে। সিংহলী ভাষায় ইহাকে বলে 'পানাব'। মাথার দুইদিকে পশুর শিঙের ন্যায় চিরুণীর দুই মাথা উঠিয়া থাকে। এইরূপ বিচিত্র বেশ শুধু নিম্নসিংহলীদের ব্যবহার করিতে দেখা যায়।

নিম্নসিংহলীদের ইংরেজিতে বলে Lowcountry Sinhalese অর্থাৎ কলম্বো এবং দক্ষিণসিংহলের সমুদ্রতীরবর্তী সিংহলীদের দেওয়া হয় এই নাম। আর মধ্যসিংহলের কাণ্ডি অঞ্চলের পার্বত্য প্রদেশের সিংহলীদের বলা হয় Upcountry Sinhalese—আপকাণ্ট্রি সিংহলীরা নিম্নসিংহলীদের হইতে সংস্কৃতিতে পৃথক্। তাহারা জাতীয় সংস্কৃতিকে কিয়ৎপরিমাণ জিয়াইয়া রাখিয়াছে।

বহু প্রাচীন কালে হয়তো মালকোচা পরার রীতি ছিল। কথিত আছে, রাজা বুদ্ধদাস (চতুর্থ শতক, যিনি বহু হাসপাতাল স্থাপন করিয়াছিলেন) প্রজাদের স্বাস্থ্য গোপনে দেখার জন্য সাধারণ লোক সাজিয়া বাহির হইতেন; দুই পায়ের ভিতরে কাপড় গুঁজিয়া পরিতেন। ইহা তো বাঙলার মালকোঁচা পরার রীতি। আধুনিক কলম্বোর থিয়েটারে প্রাচীন রাজাদের মালকোঁচা পরিয়া নামিতে দেখা যায়।

রাজপরিচ্ছদে 'সিউ-সাট-বরন' (চতুঃষষ্টি আভরণ)এর উল্লেখ আছে। খালি শরীর ৬৪ প্রকার অলংকারে ঢাকা থাকিত। রাজা-প্রজা সকলেই খোলা গায়ের উপর চাদর পরিত। সিংহলী ভাষায় চাদর বা উত্তরীয়ের নাম উত্তুরু সাল্যুয়া। পোশাক-পরিচ্ছদে সিল্ক ও জরির উল্লেখ দেখা যায়। সিল্ক আসিত চীন হইতে, আর জরি আসিত ভারতবর্ষ হইতে।

মেয়েদের বুক ঢাকা থাকিত একখণ্ড বস্ত্রে, নাম তন-পট (স্তনপট), তার উপর কাঁধে থাকিত উত্তুরু-সাল্যুয়া। ইহা অজন্তার চিত্র স্মরণ করাইবে।

কাণ্ডির স্বাধীন রাজারা যে বেশ পরিধান করিতেন এবং বর্তমানে কাণ্ডির সর্দাররা যে পোশাক পরিধান করিয়া থাকেন; এই পোশাক আসিয়াছে ওলন্দাজদের সপ্তদশ শতাব্দীর পোশাক হইতে।

আধুনিককালের পুরুষ-মেয়েদের পোশাক প্রায় একই। পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র সিংহলের বোধ হয়, স্ত্রী-পুরুষে পোশাকের ভিন্নতা নাই। পুরুষরা পরিয়া থাকে সারং, গায়ে থাকে শার্ট বা কোট, বা দুইই। সারংএর উপর বেল্টের ব্যবহার আছে। সারং ও সাহেবী পোশাকে প্যাণ্টের উপর গলায় বাঁধার টাইও কোথাও কোথাও বেল্টের ন্যায় ব্যবহার করিতে দেখিয়াছি। অনেকে সারংএর উপর রুপার শিকল ব্যবহার করিয়া থাকে। এই রুপার শিকলকে সিংহলী ভাষায় বলে হাবাডি। মেয়েরা পুরুষদের ন্যায় সারং পরে, গায়ে পরে টাইট জ্যাকেট। সিংহলী ভাষায় এই টাইট জ্যাকেটকে বলে হেট্ট, সংস্কৃত ভাষায় ইহাকে বলে কঞ্চুক।

কাণ্ডি অঞ্চলে মেয়েরা সারং পরে না, পরে একপ্রকার শাড়ী, ইহাকে বলে ওসারি। ঝালরের মত শাড়ীর কতকটা অংশ কোমরের চারদিকে ঝুলিতে থাকে, এবং খাটো আঁচলের অংশ কাঁধের উপরে ঝোলে।

ধর্মানুষ্ঠানে সিংহলীদের বিশেষ বেশ আছে। হিন্দুরা যেমন চেলী তসর গরদ পূজা উপলক্ষ্যে পরিয়া থাকে। পূর্ণিমার দিনে যখন বৌদ্ধরা পূজা দিতে যায়, তখন সব পোশাক একদম সাদা হওয়া চাই। সাদা কাপড় লং-ক্লথ হইতে তৈরি লুঙ্গির মত পরা, আমাদের দেশের সাদা থানধুতি নহে। সিংহলী ভাষায় এই সাদা কাপড়কে বলে রেন্দা। গায়ে বেনিয়ান (খাটো পাঞ্জাবী), ও উত্তুরু-সাল্যুয়া (চাদর—লংক্লথ হইতে তৈরি)।

শহরে যারা ইংরেজি শিক্ষিত, তারা তো একেবারে সাহেব। নিজেদের বেশ বলিয়া তাদের কোনো বেশ নাই, এমনকি সামাজিক ক্রিয়াকর্মও নহে। বিবাহ, সামাজিক নিমন্ত্রণ প্রভৃতি সুট পরিয়া হয়। আমাদের দেশে যারা উৎকট সাহেব তারাও বিবাহ শ্রাদ্ধ প্রভৃতি সামাজিক ক্রিয়াতে জাতীয় ধারা রক্ষা করিয়া চলে। সিংহলে এমন-কিছু বাধ্যবাধকতা নাই। কেহ মরিলে হাতে কালো ফিতা বাঁধিয়া থাকে। এক সিংহলীর নিকট শুনিয়াছি, ইহা নাকি প্রাচীন সিংহলী প্রথা, খৃস্টানদের নিকট হইতে ধার করা প্রথা নহে।

সিংহলের আভিজাত্যের নিদর্শন এক অদ্ভুত খিচুড়ি পোশাক আছে। সাধারণ সুটের উপর একটা সাদা কাপড় কোমর হইতে হাঁটুর নীচ পর্যন্ত জড়াইয়া পরা হয়। আমাদের দেশের রায়-সাহেব রায়-বাহাদুররা যেরকম চোগা-চাপকান পিরিলি-পাগড়ি পরিয়া থাকেন, এও সে ধরনের সিংহলের অভিজাত সম্প্রদায়ের পোশাক। মুদলিয়র ও মুহন্দিরামরা এ ধরনের পোশাক পরিয়া থাকে। মুদলিয়র হইল আমাদের দেশের রায়-সাহেব শ্রেণীর উপাধি, মুহন্দিরাম রায়-সাহেব হইতে ছোট।

ইংরেজি-শিক্ষিত জাতীয়তাবাদীরা এক ধরনের পোশাক পরিয়া থাকেন—ন্যাশনাল ড্রেস নামে তাহা পরিচিত—পাড়-ওয়ালা ধুতি। সিংহলে সাধারণের মধ্যে ভারতীয় ধুতির চলন নাই; লংক্লথ, ছিটের কাপড়, কোটের কাপড় লুঙ্গির মতন মাদ্রাজী ধরনে পরিয়া থাকে। তৎসহ বেনিয়ান ও চাদর। চাদর বাঙালীদের মত পরে না। অল্প চওড়া লম্বা চাদর গলায় এক বেড় জড়ানো, ও দুই কাঁধ হইতে দুই দিকে পা পর্যন্ত ঝোলে। সম্ভবত এই পোশাক মাদ্রাজী ও বাঙালী পোশাকের সমন্বয়ে সৃষ্টি হইয়াছে। পায়ে থাকে রোমান স্যাণ্ডেল। শ্রীযুক্ত পি ডি এস কুলরত্ন এই পোশাকের প্রচার করিয়াছেন। শহরের শিক্ষিত মেয়েদের মধ্যে তেমনি কারো কারো আধুনিক বাঙালী মহিলার মত বেশ দেখা যায়। জাতীয় নেতা স্বর্গীয় ডন ব্যারণ জয়তিলকের পত্নী এই বেশের প্রচার করিয়াছেন। ইঁহারা বাঙালী মেয়েদের অনুকরণে মাথায় কাপড় দেন; এখানে বলা দরকার সিংহলী মেয়েদের ঘোমটা দেওয়ার প্রথা নাই। বৌদ্ধধর্ম স্ত্রীলোকদের স্বাধীনতা দান করিয়াছে। হিন্দুধর্মে স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা নাই।

ব্যবসায়-বাণিজ্য

এখন যেমন, প্রাচীনকালেও তেমনি, সিংহলীদের ব্যবসা-বাণিজ্যে যত্ন নিতে দেখা যায় না। চাষবাস করিয়া কারুকর্ম করিয়া জীবনধারণ উপযোগী অন্নবস্ত্র পাইয়াই তারা খুশি হইয়াছে, তাহাদের অভাবও ছিলনা।

পূর্ব হইতে জাহাজে করিয়া পণ্যসম্ভার লইয়া চীনারা আসিয়াছে, আরবরা এবং পারস্য-বাসীরা আসিয়াছে পশ্চিম হইতে। এই দুই জাতির মধ্যে পণ্যের বিনিময় হইয়াছে। সিংহল ছিল বিদেশী জাতির পণ্যের বন্দর। এইসকল পণ্য বিনিময়ে সিংহল ছিল নিষ্ক্রিয়। সিংহলের অপর পার হইতে দক্ষিণভারতের তামিলরা সর্বদাই আসিয়া ব্যবসা-বাণিজ্য করিয়াছে, এবং তারা আজো করিতেছে। তাহারা মান্নার উপসাগরে মুক্তার ব্যবসায় করিয়াছে।

বাংলার কাব্য বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল (পঞ্চদশ শতাব্দী) এবং কবি নারায়ণদেবের পদ্মপুরাণে সিংহলের সঙ্গে বাণিজ্যের উল্লেখ আছে। ইহা কাব্যিক কল্পনা ছাড়া কিছু নহে, ইহার কোনো ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই।

প্রাচীনকালে রপ্তানি হইয়াছে রত্ন মুক্তা এবং শঙ্খ। ইহার পরিবর্তে প্রায়শই ভারত হইতে আমদানি হইয়াছে ক্রীতদাস, রথ এবং ঘোড়া। ভারত হইতে সিংহলে আর আসিয়াছে জরির কাপড়, ধুনা, চন্দনকাষ্ঠ, একপ্রকার মাটি এবং মেঘের রঙের মত একপ্রকার পাথর। সিল্ক ও সিন্দুর আসিত চীন হইতে। চীনের সঙ্গে এক সময় প্রচুর বাণিজ্য ছিল। পশম ও কার্পেট আসিত কাশ্মীর ও পারস্য হইতে। কাশ্মীর ও সিংহল দুই দেশে একই ধর্ম থাকায় যোগাযোগ ছিল; কাশ্মীরের ইতিহাস রাজতরঙ্গিণীতে ইহার উল্লেখ আছে।

দ্বাদশ শতাব্দীর আরব লেখক এদ্রিসি সিংহলের ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধে লিখিয়াছেন।

এদ্রিসি ভারত বা সিংহলে পদার্পণ করেন নাই। যেসকল বণিক ও নাবিক এখানে আসিয়াছে, তাহাদের কাছে শুনিয়া এসব লেখা—

"অ্যাডাম্‌স্‌ পিকের আশে-পাশে নানা রকম বহুমূল্য রত্ন পাওয়া যায়, এবং সমতল ভূমিতে হীরা পাওয়া যায়, যাহা আংটিতে বসানো হয়। এই পর্বতে সুগন্ধ দ্রব্য, মুসব্বর, মৃগনাভী যাহা হইতে পাওয়া যায়, সেই জন্তু পাওয়া যায়। দ্বীপের লোকেরা ধান, নারিকেল ও আখের চাষ করে। নদীতে পাওয়া যায় পাথুরে স্ফটিক—তার বৈশিষ্ট্য হইতেছে আকারে এবং ঔজ্জ্বল্যে। সমুদ্রে নানাপ্রকার মৎস্য এবং মুক্তা পাওয়া যায়। সমগ্র ভারতে এমন রাজা নাই, যার ধনদৌলত সিংহলের রাজার সঙ্গে তুলনা করা যায়। তাঁহার মণি-মাণিক্য এবং মুক্তা নিজের দেশে জাত। চীন এবং প্রতিবেশী সকল দেশের জাহাজ এখানে ভিড় করে। ইরাক হইতে মদ্য এবং পশম আসে। রাজা দেশবাসীর জন্য মদ্য ক্রয় করেন, কিন্তু ব্যভিচার নিষিদ্ধ।

সেরেনদিপের (সিংহল—প্রাচীন আরবেরা সিংহল দ্বীপকে সেরেনদিপ বলিত) রপ্তানি হইল সিল্ক জহরত স্ফটিক হীরা এবং সুগন্ধদ্রব্য।

সিল্কের যে উল্লেখ আছে, তাহা সিংহলে প্রস্তুত নহে, চীনের সিল্ক সিংহল হইতে বাহিরে যাইত।

সিংহলের রত্নপুর নামক স্থান পদ্মরাগমণির জন্য বিখ্যাত। প্রাচীন নাবিকেরা সিংহলের জহরতের খ্যাতি পূর্বে পশ্চিমে রটাইয়াছে। মার্কো পোলো যদিও সিংহলে আসেন নাই, কাছ দিয়া গিয়াছেন মাত্র, তবু তিনি সিংহলের দৌলতের খ্যাতি রটাইয়াছেন। আরব্যোপন্যাসে সেরেনদিপের মণিমাণিক্যের উল্লেখ আছে।

বন্দর : বর্তমানের ন্যায় প্রাচীনকালেও গল-বন্দর বিখ্যাত ছিল। রোম চীন ও আরবের লেখকেরা গল-বন্দরের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এক সময় নিশ্চয়ই রোম আরব ও চীনের জাহাজ এখানে ভিড় করিত।

টেনেণ্ট লিখিয়াছেন—ইহা (গল) বাণিজ্যের প্রধান বাজার ছিল, যাহা পর্যায়ক্রমে পশ্চিম এশিয়ার প্রত্যেক দেশকেই ঐশ্বর্যশালী করিয়াছে, এবং রোমের বণিকদের রাজার পর্যায়ে উন্নীত করিয়াছে।

রোম সম্রাট ক্লডিয়াসের দরবারে সিংহলের দূত গিয়াছিল।
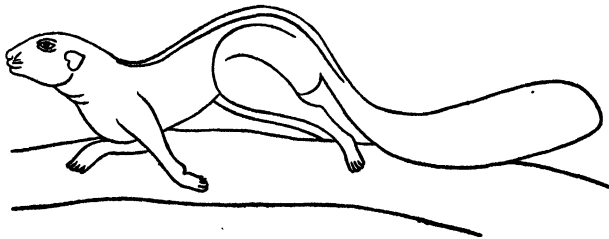
চীনারা গলে আসিত মালয়ের পথে। মালয়ের বন্দরে, যেখানে সিংহলগামী জাহাজ লাগিত, সে স্থানের নাম ছিল আজুঙসেনান (জাঙ্ক-সিংহল, মালয় ভাষায় চীনা জাহাজ জাঙ্ককে আজুঙ বলে)। সিংহলে কি কি দ্রব্য উৎপন্ন হয়, তাহার ফর্দ চীনা লেখক দিয়াছেন। ধান্য শাকসব্জী মুসব্বর চন্দনকাষ্ঠ আবলুস-কাঠ কর্পূর সুপারি শিম তিলশস্য নারিকেল এবং তালগাছ হইতে প্রস্তুত সুরা গোলমরিচ ইক্ষু ধুনা তৈল ভৈষজ্য এবং কার্পাস বস্ত্র হাতী এবং হাতীর দাঁত, স্বর্ণালংকার এবং জহরৎ, বুদ্ধমূর্তি, মন্দিরের অনুকৃতি।

ওয়েতাতার রাজত্বের সময় (৩৮৬-৫৫০) চীনা ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন,—মধ্য এশিয়া হইতে রাজগণ কারিগর পাঠায়াছিলেন নকল সংগ্রহ করিতে। কিন্তু নানটের মূর্তি হইতে কেহ উৎকৃষ্ট মূর্তি নির্মাণ করিতে পারে নাই। দশ পা দূর হইতে নানটের মূর্তি চমৎকার দেখাইত, আর কাছে আসিলেই বহিঃরেখা লুপ্ত হইত।

নানটে হইল সিংহলী বৌদ্ধ ভিক্ষু, যিনি ৪৫৩ খৃস্টাব্দে সম্রাটের কাছে দূত স্বরূপ গিয়াছিলেন; তিনি নিজের নির্মিত তিনটি বুদ্ধমূর্তি লইয়া গিয়াছিলেন।

নানাপ্রকার মূল্যবান প্রস্তরের উল্লেখ চীনা লেখকগণ করিয়াছেন, তার মধ্যে এরকম লাল রঙের উজ্জ্বল মণি ছিল, যার দীপ্তিতে রাত্রে প্রদীপের কাজ চলিত। মণিমাণিক্যের বদলে চীনারা আনিত সিল্ক, চীনামাটির বাসন, এনামেল করা পাত্র।

ষষ্ঠ শতাব্দীতে সিংহলের সম্রাট চীনের অধীনতা স্বীকার করেন। ৫১৫ খৃস্টাব্দে কুমারদাস সিংহাসনে আরোহণ করিলে, চীনের সম্রাটকে উপঢৌকন পাঠান এবং তৎসঙ্গে লিখিয়া পাঠান,—আমার নিজেরই চীনে যাওয়ার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু বাতাস ও ঢেউয়ের ভয়ে যাওয়া হইল না।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে সিংহলের সম্রাট ষষ্ঠ বিজয়বাহু বৌদ্ধ-বিদ্বেষী ছিলেন; তিনি বৌদ্ধদের উপর অত্যাচার করিতেন ও বিদেশীদের লাঞ্ছিত করিতেন। ১৪০৫ খৃস্টাব্দে চীন হইতে দন্তমন্দিরে ধুনা ও অন্যান্য উপহার দ্রব্য পাঠান হয়। রাজা চীনাদের অপমানিত
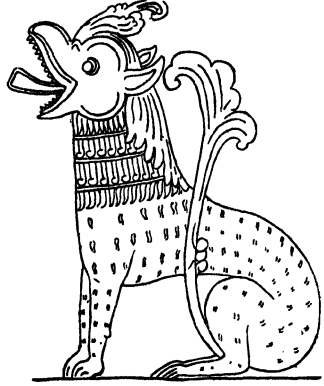
করেন। মিং-শিতে (মিং রাজত্বের ইতিহাস) উল্লেখ আছে, সম্রাট চিং-টস্ ইহাতে ক্রোধান্বিত হইলে সেনাপতি চিং হোকে ৬০ খানি জাহাজ লইয়া সিংহলকে শিক্ষা দিবার জন্য প্রেরণ করেন। চিং হো কোচিন চীন জাভা কাম্বোডিয়া শ্যাম প্রভৃতি দেশে চীন সম্রাটের আভ ঘোষণা করেন। যাহারা চীন সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করে না, তাহাদের জোর করিয়া বাধ্য করা হয়। ১৪০৭ খৃস্টাব্দে চিং হো চীনে ফিরিয়া যান। অনেক জাতি চীনে দূত প্রেরণ করে।

পর বৎসর চিং হো সিংহলের গাম্পোলা আক্রমণ করেন, রাজা-রানী, তাঁহার সন্তানগণ ও প্রধান অমাত্যগণকে বন্দী করিয়া চীনে লইয়া যান। চীনের মন্ত্রিগণ প্রাণদণ্ডাজ্ঞার জন্য মত দেন। কিন্তু সম্রাট পরিবারের একজন ধার্মিককে সিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়া সকলকে সিংহলে পাঠাইয়া দেন।

মুর ও সিংহল : সিংহলে যে-সব মুসলমান অধিবাসী আছে, তাহাদিগকে মুর বলা হয়, প্রকৃতপক্ষে তাহারা মুর নহে, আরবের অধিবাসী। ষোড়শ শতাব্দীতে মালাবার হইতেও কিছু মুসলমান আসিয়া তাহাদের দলে যোগ দিয়াছে। বহু প্রাচীনকাল হইতে আরবরা জাহাজ লইয়া, সিংহলের তটে আসিয়াছে, মহম্মদের পূর্বেও তাহাদের আসিতে দেখা যায়। বিশেষ করিয়া দশম হইতে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত আরব হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতবর্ষ সিংহল জাভা সুমাত্রা ও চীনের তট পর্যন্ত তাহাদের অবাধ বাণিজ্য ছিল আরবরা সিংহলের জাফনা মান্নার কুডরামালি পুটলাম গল ট্রিনকোমালে প্রদেশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে।

সিংহলের সমুদ্রতটে এক সময় মুরগণের আধিপত্য ছিল, সিংহল-সম্রাটের প্রতাপ সেখানে পেঁছিত না। বারো শ এবং তেরো শ শতাব্দীতে মুরগণ সমুদ্রতীরে কালাম্বু বন্দর স্থাপন করে। ইবন বাটুটা ১৩৪০ খৃস্টাব্দে কালাম্বুকে সেরেনদিপের শ্রেষ্ঠ শহর বলিয়া গিয়াছেন।

মুরদের ক্ষমতা ক্রমশ বাড়িতে থাকে। ষোড়শ শতাব্দীতে তাহাদের চরম ক্ষমতা হয়। কোট্টের রাজা সপ্তম বিজয়বাহু তখন দুর্বল। ১৫৩৪ খৃস্টাব্দে তিনি একজন মুর কর্তৃক নিহত হন। সিংহলে মুরদের একচেটিয়া ব্যবসা-বাণিজ্য দেখিয়া পর্তুগিজগণ সিংহলে পদার্পণ করে। পর্তুগিজরা মুরদের ক্ষমতা লুপ্ত করে,' তাহারা না আসিলে জাভার ন্যায় সিংহল হয়ত মুসলমানদের রাজ্যে পরিণত হইত। পর্তুগিজরা ১৫১৭ খৃস্টাব্দে কালাম্বুতে দুর্গ নির্মাণ করে এবং কলম্বাসের নামের সাদৃশ্য করিয়া কালাম্বুর নাম "কলম্বো" রাখে। ইহাই এখন বর্তমান নাম।

পোত নির্মাণ : সিংহলের ইতিহাসে যদিও দেখা যায়, ভারতের পর সুদূর প্রাচ্যে জাহাজ প্রেরণ করিয়াছে, তবুও তাহাদের সমুদ্রগামী জাতি বলা যায় না। অধুনা পৃথিবীতে ভারতীয় নাবিকের আনাগোনা দেখা যায়, কোথাও সেরকম সিংহলী নাবিক দেখা যায় না। তাহারা ধর্মপ্রচার উদ্দেশ্যে অথবা বিদেশী রাজার কাছে দূত প্রেরণ করার জন্য জাহাজ পাঠাইয়াছে। ভারতের রাজকন্যার পাণিগ্রহণের জন্য অনেক সময় ভারতের তীরে সিংহল-রাজের তরী পেঁছিয়াছে। ৪৯৫ খৃস্টাব্দে রাজা মোগল্লান সিংহলের তীর রক্ষার জ রণতরী নির্মাণ করাইয়াছিলেন, কিন্তু তার মালাবার নাবিক ছিল। তৎকালে, মালাবারের নাবিক এবং সমুদ্রযোদ্ধা হিসাবে খ্যাতি ছিল।

চীনা ইতিহাস সুই-শুতে উল্লেখ আছে, চীনের সুই রাজত্বের সময়—৬০৭ খৃস্টাব্দে—সিংহলের রাজা সমুদ্রপথে চীনের দৌত্যকে গ্রহণ করার জন্য কিউ-মো-লো নামক ব্রাহ্মণকে ৩০ খানি জাহাজের সহিত পাঠাইয়াছিলেন।

দ্বাদশ শতাব্দীতে পরাক্রমবাহু বিদেশে আক্রমণোদ্দেশ্যে পাঁচ মাসের মধ্যে বহু শত রণতরী নির্মাণ করাইয়াছিলেন।

কোথাও বাণিজ্যতরীর উল্লেখ পাওয়া যায় না।

স্বীকৃতি

এই গ্রন্থের "সিংহলে বৌদ্ধধর্মের প্রথম প্রচার" ও "সমাজ" অধ্যায় যথাক্রমে ১৩৪১ বৈশা সংখ্যা ও ১৩৪০ আষাঢ় সংখ্যা প্রবাসী পত্রে "সিংহলের চিত্র" নামে প্রকাশিত হয়। অপ অধ্যায়গুলি ১৩৫২ সালে দেশ পত্রে, "সিংহলের শিল্পের ইতিহাস" ও "সিংহলের সভ্যত নামে মুদ্রিত হয়।—শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু কর্তৃক অঙ্কিত নাইয়াণ্ডি-নর্তকের চিত্র দুই ইতিপূর্বে ১৩৪৩ কার্তিক সংখ্যা প্রবাসী পত্রে শ্রীশান্তিদেব ঘোষ লিখিত সিংহলের উৎসব কাণ্ডি-নৃত্য বা উদারানাটুম্ প্রবন্ধে প্রকাশিত হইয়াছিল।

১৯২৫-২৭ সালে আনন্দ কলেজে চিত্রাধ্যাপনাকর্মে নিযুক্ত থাকিবার কালে সিংহলে শিল্প ও সংস্কৃতির ইতিহাস আলোচনায় ব্রতী হই; সিংহলের সর্বত্র প্রাচীন শিল্পনিদর্শ প্রত্যক্ষ করারও এই সময় সুযোগ হয়।—এই পুস্তক রচনায় নিজের অভিজ্ঞতার সহিত বিবি গ্রন্থের সহায়তাও যুক্ত হইয়াছে; বিশেষভাবে টেন্নেণ্ট-রচিত CEYLON এবং আনন্দকুমার স্বামীর MEDIAEVAL SINHALESE ART গ্রন্থ ব্যবহার করিয়াছি।